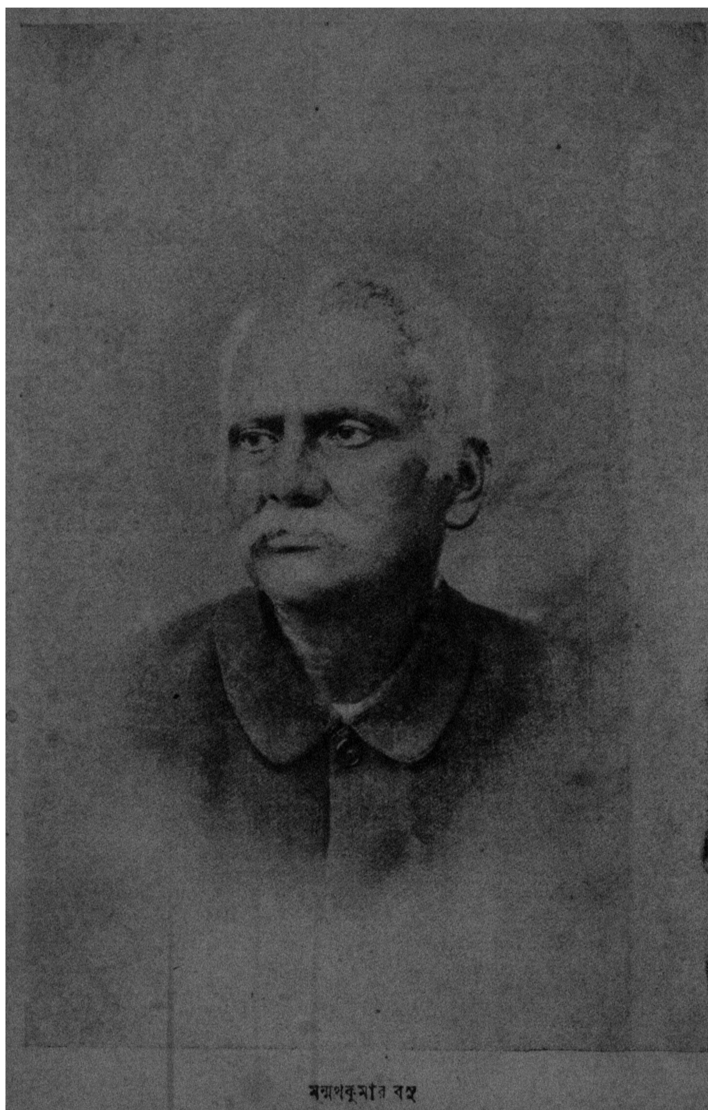


মন্মথকুমার বসু

স্মৃতিকথা

স্বর্গীয়

মন্মথকুমার বসু

রচিত

ও

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বসু,

এম-এ (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস)

কর্ত্তৃক সম্পাদিত



জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৫

মূল্য ৪৲

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই পুস্তকের রচয়িতা মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব ১৯২৪ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বহুতর কাগজপত্রের মধ্যে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে বোঝা যায় ইহা ১৯১৫ সালে লিখিত হইয়াছিল। সাধারণের চিত্ত বিনোদনে সক্ষম হইবে মনে করিয়া এতদিন পরে তাঁহার জন্মের শততমবর্ষে ইহা সাধারণে প্রকাশ করিলাম। দেশের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ পুস্তকের মূল্য স্বীকৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ইতি

কলিকাতা
২০শে আগষ্ট ১৯৪৮

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু

সূচীপত্র

চিত্র সূচী

*মাননীয় বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



এ পক্ষের জন্মবৃত্তান্ত

১২৫৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে যশোহর জেলার বিদ্যানন্দকাটি গ্রামে এ পক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মবৃত্তান্ত মাত্রেই 'জন্মগ্রহণ করা' এই শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এ পক্ষও সেই চির-প্রচলিত রীতি বহাল রাখিলেন, কিন্তু জন্মগ্রহণ বলিলে একটা স্বেচ্ছা অনুমান হয়। যেন জাতক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। কিম্বদন্তী আছে যে ভূমিষ্ঠ হইবাব অব্যবহিত পরেই এ পক্ষ তারস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ক্রন্দন দুঃখসূচক। কোন পুরাতন শাস্ত্রকার বলেন যে জাতক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সংসারের অসীম দুঃখ চিন্তা করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠে। সে কথা যদি সত্য হয় তবে এ পক্ষ যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানে ও কালে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা কিরূপে সম্ভব? স্থান ও কাল বিবেচনা করিলে এ পক্ষ কখনই ভূমিষ্ঠ হইতেন না। প্রথমে স্থানের বর্ণনা আবশ্যক। সূতিকাগার একখানি বাগুলা, বাটীর আঙ্গিনার মধ্যস্থলে নির্ম্মিত।

বাগুলা কাহাকে বলে তাহা এ কালের লোককে বুঝান সহজ নয়। তবে চেষ্টা করা যাউক। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ৪টী বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া ৫ হাত লম্বা, ৪ হাত প্রস্থ একটু স্থান বেষ্টন

করা হইল। এই খুঁটি কয়খানির উপর বাঁশের বাথারির একটী চালা উঠান হইল ও তাহার উপর দুই আঁটি খড় ছড়াইয়া বাঁধা হইল ; চতুষ্পার্শ্বে হোগলা পাতার বেড়া বাঁধা ও একটী ঝাপের দুয়ার। ইহাই সদ্যোজাত শিশুর ও প্রসূতির আট দিবারাত্রেব আবাস স্থান। ঐ চাল কতক পরিমাণে রৌদ্রের প্রখবতা নিবারক কিন্তু বৃষ্টি তাহাকে ভ্রুক্ষেপও করে না। অধিক বৃষ্টি হইলে উঠান দিয়া যখন স্রোত চলে তখন প্রসূতি অগত্যা সন্তান কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আষাঢ় মাস, কাজেই বৃষ্টির অভাব নাই। এরূপ স্থানে ও কালে কে সাধ করিয়া জন্মগ্রহণ করে বলিতে পারি না।

সূতিকাগৃহের আসবাব ও সাজসজ্জার কথা কিছু বলা আবশ্যক। এই বাঙ্গলার অভ্যন্তরে একটী পুরাতন ছিন্ন মাদুর, খানকতক ছিন্ন বস্ত্র ও একটী মাটীর প্রদীপ এই মাত্র। বাহিরে অনেকগুলি গাছ ছিল, তাহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড কণ্টক লতা বাঙ্গলা বেষ্টন করিয়া আছে। একটা গরুর মাথা (শুষ্ক হাড়) দ্বারের এক পার্শ্বে। অন্য পার্শ্বে একটা কাল হাঁড়ি গোময় লিপ্ত ও তাহাতে গোময় নির্ম্মিত কয়েকটি পুতুল। রাত্রে প্রসূতির সহচর্য্যার জন্য একটী নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক থাকিত। সে যখন বাঙ্গলায় প্রবেশ করিত অথবা প্রসূতি যখন কোন প্রয়োজনে বাহির হইয়া পুনঃপ্রবেশ করিতেন তখন চাল হইতে কতক খড় লইয়া জ্বালান হইত ও তাহা মাটীতে রাখিয়া তাহাই ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইত। গৃহিণীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে ভূত,

পেত্নী, পেঁচো, পাঁচি প্রভৃতি অপদেবতা সূতিকাগৃহে প্রবেশ না করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ঐ কাঁটালতা প্রভৃতি উপকরণ রাখা ও আগুন জ্বালা প্রয়োজন।

তাহারা সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলে কি রক্ষা আছে! শিরোমণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন এ সমস্ত বালরোগ নিবারক বহুকাল প্রচলিত ঋষিনির্দ্দিষ্ট রীতি। যাহা হউক, এ পক্ষ এই অবস্থায় গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন। গর্ভযন্ত্রণা এ দেশের চির প্রচলিত ঋষিগণের অনুমোদিত বিশ্বাস। তাঁহারা দশ মাস মাতৃজঠর বাসের কষ্ট সংসারে আসিবার এক প্রধান আপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ জাতিস্মর। তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা ও গর্ভের দুঃখ সমস্তই স্মরণ করিতে পারিতেন। যদিও বেদ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই, তথাপি পুরাণ মাত্রেই এ কথা বিচার করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে আছে যে ঋষি বামদেব বহুবর্ষ গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন ও তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় মাতৃকুক্ষী ভেদ করিয়া বাহির হইতে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্রদেব তাঁহার এই অনৈসর্গিক অভিলাষ পূরণ করিতে দেন নাই।

ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই হইতে পারে যে ঋষি বামদেব সংসার যন্ত্রণাকেই গর্ভযন্ত্রণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুরাণ কর্ত্তারা এই রূপক উপাখ্যানকে প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়া এই অদ্ভুত বিশ্বাস সমাজে প্রচলন করিয়াছেন। পৌরাণিক ঋষিগণ সকল

ঘটনাতেই বেদের দোহাই দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপে পুরাণের অনেক অদ্ভুত বিশ্বাস বেদোক্ত বাক্য বিশেষের অর্থ বিপর্য্যয়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দ্বাদশ সহস্র বৎসর পরমায়ু, সহস্র বৎসর অনশনে তপশ্চরণ, ঋষিগণের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রভৃতি পৌরাণিক উক্তি বেদসম্মত নহে ইহা আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন। ইঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিলে হিন্দুস্থানীয় অনেক বিশ্বাস ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব ইঁহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদিবার কারণ যদি সংসার দুঃখময় বিবেচনার ফল না হয় তবে কি হইতে পারে? কেহ বলেন শিশু বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে শীত অনুভব করিয়া কাঁদে। কিন্তু ১৫ মিনিট পরে ঐ কান্না থাকে না, গাত্রাবরণ খুলিলেও কাঁদে না। কেহ বলেন যে ভূমিষ্ঠ হইলে বাহিরের বাতাস সবেগে ফুস্ফুসিতে প্রবেশ করে ও বহির্গত হয়। এই বাতাসের প্রবল বেগে গতির জন্য শব্দকোষে এই চীৎকার সঙ্ঘটিত হয়।

অতএব এ পক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া সকলকে জানান নাই যে তিনি সংসারে এক নূতন প্রাণী আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইতি জন্মবৃত্তান্ত

শৈশব

ষষ্ঠ দিবস সন্ধ্যাকালে বালকদিগকে আটকড়াই বিতরণ হইল ও শিশুর ভাগ্য স্থির করিবার জন্য বিধাতা পুরুষকে তলব করা হইল। দোয়াত, কলম, ধানদূর্ব্বা সাজাইয়া একটী পাত্রে শিশুর নিকট রাখা হইল। বিধাতা পুরুষ রাত্রে অবসর মতন ভাগ্য লিখিয়া দিবেন। বর্ষাকালের রাত্রে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ তিন চার মাস না যাইতেই শিশুর স্বাভাবিক অবলম্বন মাতৃবক্ষ হইতে বঞ্চিত হইলাম। মাতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া পিতামহীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক, এক মাস পরে ষষ্ঠী পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইল, মাটীর লতা গঠন সিন্দুরালঙ্কৃত দিয়া লতা সাজান হইল। খৈ বাতাসা বালকদিগকে বিলান হইল। তৈল মৎস্যও সম্ভবতঃ বিলান হইয়াছিল। ছয় মাস বয়সে পিতৃ পুরুষদিগকে আনন্দে নৃত্য করিতে আহ্বান করিয়া অন্ন-প্রাশন সম্পন্ন হইল। পূর্ব্বপুরুষগণের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহাদের আর অন্নজলের অভাব হইবার সম্ভাবনা ঘুচিয়াছে, যেহেতু তাঁহাদের বংশের শ্রাদ্ধাধিকারী উপস্থিত। তাঁহারা আশা করিয়া থাকুন যে তর্পণের জল ও পিণ্ড যথাসময়ে পাইবেন।

১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে পিতৃদেব রোগগ্রস্ত হইয়া যশোহর

হইতে গৃহে আসিলেন। জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশে চিকিৎসক নাই। ডাক্তারের নাম তখন কেহ শোনে নাই, শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যও দুর্লভ। রাজা ও বড় বড় জমিদারের গৃহে দেখা যাইত। পল্লীগ্রামে তাহাও ছিল না। দুই চারিটা ঔষধ জানেন ও হস্তলিখিত ২।৪ পাতা ঔষধ প্রস্তুতের প্রকরণ রাখেন এমন লোক ভদ্রপল্লীতে প্রায় পাওয়া যাইত। সেরূপ চিকিৎসক নিযুক্ত হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। একদিন সন্ধ্যার সময় দাদাদের সঙ্গে পাঠশালা হইতে গৃহাভ্যন্তরে আসিতে আমাদিগকে 'একটা ঘরে বন্ধ করিয়া শুইতে দিল। আহারের নামও করিল না। অল্প পরে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

পিতা অল্পদিন মাত্র যশোহরে ওকালতি করিয়াছিলেন। সেকালে উকিলদিগের মান প্রতিপত্তি একালের মত ছিল না। আয়ও সামান্য ছিল। তখন আমলাদেরই কাল। ৮ টাকা মাহিয়ানার সেরেস্তাদার তখন মাসে ১০০০ টাকা উপায় করিত। জেলার প্রধান উকিল ৫০ টাকাব বেশী আয় করিতে পারিত না।

পিতা সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি জমিদারের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া বংশের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজ সন্তানদিগের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তখন পিতামহ, পিতামহী বর্ত্তমান এবং পিতার দুই সহোদর ভ্রাতা ও দুই খুড়তুত ভ্রাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নীও সংসারে থাকিতেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যা লইয়া আমরা ৮।৯ ভ্রাতা ও ৪।৫ ভগ্নী এক গৃহে প্রতিপালিত হই। এই বৃহৎ

পরিবারের সম্পত্তি হইতে আয় বৎসরে ৪০০ টাকার অধিক ছিল না। ইহাতেই আমরা গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়া পরিগণিত কারণ আমরা রূপার মল আটবেকি ও সোনার বাজু পরিতাম। ইহার অল্পদিন পরে খুল্লতাত মহাশয় মুন্‌সফি চাকরী পাইলেন। তখন মুন্‌সফের মাহিনা একশত টাকা। সেই অবধি আবার দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। তখন প্রত্যেক গৃহস্থ যাহার অবস্থা শোচনীয় নহে সেই দুর্গোৎসব করিত। দুর্গোৎসবের বিষয় পরে বলা যাইবে।

আমাদের গৃহে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। গুরু মহাশয় মাসে ৩৷৹ টাকা মাহিনা ও আহার পাইতেন। অন্য গৃহের বালকদিগের নিকটও কিছু কিছু পাওনা ছিল। ইহাকে পাঠশালা কেন বলিত. বোঝা যায় না। কোন পুস্তক পাঠ হওয়া দূরের কথা, কোন পুস্তকই ছিল না। ছাপার বহির মধ্যে গ্রামে কেবল পাঁজি দেখা যাইত।

পড়া ত হইত না, লেখা হইত। ৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই পাঠশালে গতিবিধি আরম্ভ হইল। কতকগুলি তালপাতা একটি ছোট মাদুরে জড়াইয়া বগলে ও হাতে দোয়াত কলম লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত। প্রথমদিন একজন তালপাতায় ক, খ, প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ সিজের আঠা দিয়া লিখিল ও তাহাতে কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিল। সেই অক্ষরগুলিতে কালি বুলান আমার কার্য্য, তিন চার বার কালি বুলাইলে পাতাখানি যখন কালিতে এমন চিত্রিত হইত যে অক্ষর আর দেখা যায় না, তখন

পুকুরে নিয়া ধুইয়া ফেলি, শুকাইলে আবার অক্ষরগুলি পূর্ব্বের মত প্রকাশ পায়। স্বরবর্ণগুলিও ঐরূপে লিখিয়া দিল। স্বর ব্যঞ্জন বলিয়া অক্ষরগুলিকে তখন জানিতাম না। সিদ্ধিরস্তু ছিল বর্ণের নাম। কারণ প্রথমে সিদ্ধিরস্তু লেখা থাকিত। পাঠশালে লিখিবার সময় পড়িয়া লিখিতে হইত। পড়িবার জন্য বর্ণগুলির আকৃতির বর্ণনা করিতে হইত। আকুড়ে ক বগঠুঠ খ, ইত্যাদি। সুর করিয়া পড়িতে হইত, যতক্ষণ আকুড়ে ক বলিতে সময় লাগিত ততক্ষণ ক লেখা হইয়া যাইত। বর্ণ পরিচয় এইরূপে ২।৩ মাসের কমে শেষ হইত না। প্রত্যহ পাঠশালা ছুটী হইবার পূর্ব্বে গণিতের শতক ও নামতা প্রভৃতি চীৎকার করিয়া পড়িতাম ও পরে সরস্বতীর বন্দনা হইলে তবে ছুটী হইত।

প্রাতে উঠিয়াই পাঠশালায় গমন। ঘণ্টাখানেক পরে বাল্যভোগ বা প্রাতরাশের জন্য ভিতরে তলব হইল। প্রাতরাশ গলাভাত। তাহাতে লবণ ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ থাকিত না। কিন্তু সে যে উপাদেয় খাদ্য ছিল তাহা বর্ণনাতীত। সেরূপ আস্বাদ কৈশোরে পদার্পণ করিয়া আর কখনও পাই নাই। পরে যতপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য আহার করিয়াছি সেই শিশুকালের গলাভাত যেমন সুস্বাদ ও তৃপ্তিকর বোধ হইত তেমন আর কিছুতেই হয় নাই।

বাল্যভোগের পর আবার পাঠশালা বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিত। আবার বিকালে পাঠশালায় আসিতে হইত। সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয় কোন কোন দিন মুখে মুখে গণিত শিখাইতেন।

বর্ণ পরিচয় হইলে সংযুক্ত বর্ণ, পরে নাম লেখা। নাম লেখা শিক্ষা হইলে, তালপাতা ফেলিয়া কলার পাত বা চিল্‌তা ধরিতে হইত। চিল্‌তায় গণিতশিক্ষা। যোগ বিয়োগ ও শুভঙ্করের হিসাব এই মাত্র গণিত। অব্যক্ত ত্রৈরাশিক বা ভগ্নাংশ শিখিবার রীতি ছিল না। মণ কষা, সের কষা, বিঘা কালি প্রভৃতি শুভঙ্করের নিয়ম যেখানে না খাটে এরূপ হিসাব করা গুরু পাঠশালেব বিদ্যায় কুলায় না।

গণিত শিক্ষা শেষ হইলে কাগজে লেখা। কাগজে দূরস্থিত বন্ধুর নিকট পত্র লিখিতে হইত। এই পর্য্যন্ত পাঠশালাব সাধারণ বিদ্যার দৌড়। ইহাতেই ৭।৮ বৎসর কাটিয়া যাইত; আমি ৯ বৎসর বয়সে পাঠশালায় উত্তীর্ণ হইলাম।

আমাদের গৃহে অনেকগুলি হস্তলিখিত মহাভারত ও রামায়ণ ছিল। ইতিমধ্যে সেগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছিলাম। কাশীদাসের মহাভারত সে কালের অতি উপাদেয় বস্তু। এমন বুদ্ধিমান ছিলাম যে ভাবিতাম সে কালের লোকেরা পয়ারে কথা-বার্ত্তা করিত। ৭।৮ বৎসরের বালকের মহাভারতের অলৌকিক কাণ্ড সকল পড়িয়া মানবের ক্ষমতার অদ্ভুত ধারণা হইত। তীরে বৃক্ষ, প্রস্তরাদি ভেদ করা যায়; অগ্নি ও জল বর্ষণ করা যায়; হস্তী গণ্ডার ফুঁড়িয়া দেওয়া যায়। ক্রোধ যতই বৃদ্ধি হয় ততই শরীরের বল বাড়ে। এই সকল ধারণা স্বতঃই বালক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। বালক হৃদয়ে কেনই বা বলি যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে গ্রন্থকারদিগের

সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ক্রোধের সঙ্গে বল বৃদ্ধি হয়। বোধ হয় ইহার কারণ এই যে গ্রন্থকারগণ সকলেই ব্রাহ্মণ, যুদ্ধের জ্ঞান তাঁহাদের নিজের কিছু মাত্র ছিল না।

পাঠশালের বিদ্যা লিখিতে ও পড়িতে শেখা ও সামান্য হিসাব করিতে পারা ইহাতেই পর্য্যবসিত হইত। সে কালে সাধারণ লোকের আর অধিক শিক্ষার প্রয়োজন হইত না। ব্রাহ্মণগণ টোলে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায় পড়িতেন। কিন্তু টোলে অপর জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। বৈদ্যেরা নিজ গৃহে কিঞ্চিৎ ব্যাকবণ ও চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিতেন, সেও অতি কম লোকে। কায়স্থগণ কেহ কেহ পার্শীও পড়িতেন, কিন্তু পার্শী শিক্ষার সুযোগ অতি সামান্যই ছিল।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় থাকিতে একটী কায়স্থ বালকেব সঙ্গে পরিচয় হয়। তাহার নিবাস কবতক নদীর ধারে। সে অমরকোষের স্বরবর্গ মুখস্থ বলিত। সে বলিল তাহাদের গুরু-মহাশয় অমরকোষ পড়ান।

পরে যখন মাইকেল মধুসূধন দত্ত মহাশয়ের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ হইল তখন তাহাতে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ এবং এক দ্রব্যের অনেক নাম দেখিয়া বোধ হইল যে সংস্কৃত কোষ মুখস্ত না থাকিলে এরূপ শব্দের সহজ সন্নিবেশ সম্ভবে না। সেইজন্য বোধ হইল মাইকেল পাঠশালে অমরকোষ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় যে বিশেষ দখল ছিল এমন বোধ হয় না। অন্যথা তিনি বাল্মীকির রামায়ণ ত্যাগ

করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মেঘনাদ বধ প্রণয়ন করিতেন না। বাল্মীকির লক্ষ্মণ অত কাপুরুষ নহে।

গুরুমহাশয় বর্ণনা না করিয়া পাঠশালা ত্যাগ উপযুক্ত নহে। একখানি চৌকির উপর গুরুমহাশয় বেত্র হস্তে সমাসীন। এক একটী বালককে নিকটে তলব হইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা হইল পুস্তক আনিয়াছ কিনা, আগের দিন সে কেন আসে নাই, সে কি লিখিতেছে ইত্যাদি। সৌভাগ্যক্রমে দুই ঘা বেত না খাইয়া যদি সে পরিত্রাণ পাইল তবে তাহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে, কিন্তু সে সৌভাগ্য খুব কম বালকেরই হইত। কেহ কেহ চৌদ্দ পোয়া, কেহ ঘু ঘু মোড়া সাজা পাইত। চৌদ্দ পোয়া অর্থ ৩ খানা ইটের উপর দুই পা ও একহাত রাখিয়া আর একখানা হাত উচা করিয়া একখানি ইষ্টক ধারণ।

ঘু ঘু মোড়া দুই হাঁটুর নীচ দিয়া দুই হাত উঠাইয়া নিজের কান জোর করিয়া ধরিয়া থাকা। ইহা ভিন্ন এক পায়ে খাড়া, কানমলা প্রভৃতি অনেক প্রকার শাস্তি ছিল। গুরুমহাশয়ের অধিকার পাঠশালার গৃহে সীমাবদ্ধ নহে। কোন ছাত্র অনুপস্থিত থাকিলে ৪।৫ বালক তাহাকে ধরিয়া তোলাতুলি আনিবে। আনিবার গীতও ছিল,

গুরুমহাশয় গুরুমহাশয় তোমার পোড়ো হাজির,
হাজির না কর্ত্তে পারি ১০ বেতের বাড়ি।
পোড়ো মহাশয় পোড়ো মহাশয় আমার দোষ কি,
গুরুমহাশয় বলে দেছেন বেঁধে নে যাতি।

গ্রামে বরযাত্র আসিলে ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের প্রাপ্য চাঁদা আদায় করিতে নিযুক্ত হইত।

গুরুমহাশয় গুড়ুকের বড় প্রিয়, প্রত্যেক ছাত্র পাঠশালায় আসিবার সময় কিছু কিছু গুড়ুক আনিবে। ভাল·গুড়ুক যে আনে তাহার প্রশংসা হইত। গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক সাজা কর্ম্মে অনেকে ধুমপান করিতে শিখিত।

দুর্গোৎসব

সেকালে দুর্গোৎসব প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ঘরে হইত। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে ১০।১২ খানা প্রতিমা হইত। এখন একখানাও হয় না। ভাদ্র মাসে কাঠাম প্রস্তুত আরম্ভ হইল, পরে কুমার আসিয়া প্রতিমা গড়িল ও পটুয়া চিত্র করিল ও পূজার একদিন অগ্রে সাজ ও বস্ত্রাদি দিয়া মনোহর সজ্জায় প্রতিমা প্রস্তুত হইল। এই সকল প্রক্রিয়া দেখা ও উপভোগ করাতে বালকের যে কত আমোদ তাহা বলা যায় না। ষষ্ঠীর বোধন হইতে পাঁঠা কাটা আরম্ভ হইল।

এদিকে প্রকাণ্ড এক ডোল মুড়কি প্রস্তুত ও শত শত নারিকেল ছেদন করিয়া তাহার নাড়ু প্রস্তুত হইল। বালকগণ নাড়ু প্রস্তুতের সাহায্য করে ও মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর চক্ষুর আড়ালে এক একটী মুখে ফেলে।

চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ফল ও পত্রপুষ্প সজ্জিত।

সপ্তমীর দিন আসল পূজা আরম্ভ। দলে দলে নাগরা, ঢাক, ঢোল আসিয়া জুটিল। একদল যাত্রাওয়ালা আসিল, তাহারা সমস্ত রাত্র গান চালাইবে।

সপ্তমীর দিন পুরোহিতগণ গম্ভীর স্বরে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

পল্লার লোকদের ভোজনের নিমন্ত্রণ, তাঁহারা পালা করিয়া এক এক বাড়ী এক এক দিন যাইবেন। বৎসরের মধ্যে মাংসাহার প্রায় দুর্গোৎসব ভিন্ন অন্য সময়ে জোটে না। কাজেই বালকদিগের পাঁঠা বলির মাংস খাওয়া প্রধান আমোদ। পল্লীতে যে যে গৃহে পূজা আছে সকল গৃহেই জলযোগের নিমন্ত্রণ। বালকগণ নূতন বস্ত্র, নূতন চাদর, নূতন জুতা পরিয়া বাড়ী বাড়ী পূজা দেখিয়া বেড়ায়। বাড়ীতেও কাজ বিস্তর। যত কাঙ্গালী আসিবে তাহাদিগকে মুড়কি, চিঁড়া, নারিকেল নাড়ু, চাল, ডাল বিলান হয়। হিন্দু মুসলমান কেহই বাদ যায় না। ব্রাহ্মণগণ জলযোগ ও ভোজন দক্ষিণা কিছু পয়সা পান। এই সকল আমোদের পর রাত্রে আর যাত্রা শোনা ঘটিয়া ওঠে না, যাত্রাস্থানে বসিবামাত্র সকলেই ঘুমে অভিভূত হইয়া পড়ে। নবমী পূজার দিন কাণ্ড কিছু বৃহৎ, ৩০।৪০টা পাঁঠা আসিয়া জুটিল। প্রজারা কবুলিয়তের সর্ত্তানুসারে কেহ পাঁঠা, কেহ ভেড়া আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা মহিষও ক্রয় হইয়া আসিল। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ

করিলেন যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ, তস্মাৎ যজ্ঞে বধোবধঃ। এক একটা পাঁঠা ছেদন হইতেছে অন্যগুলি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে ও তাহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া শব্দ বাহির হইতেছে না। এক একটি ছেদন হইতেছে আর সকলেই জগৎমাতাকে প্রণাম করিতেছে আর বলিতেছে 'মা নেও'। উঠান রক্তে কাদা হইয়া গেল। ছাগ, মেষ, মহিষ বলি শেষ হইলে একটি কুষ্মাণ্ড তাহার উপরে হরিদ্রার নরমূর্ত্তি ও হরিদ্রা বস্ত্রের আবরণ—ইহা নরবলির অনুকল্প—তাহাও রীতিমত ছেদন হইল। এক একটি সরায় প্রত্যেক পশুর একটু রক্ত, একটু মাংস লইয়া প্রতিমার সম্মুখে রাখা হইল। যবনিকা পতন হইল। কারণ ভগবতী তখন আহারে নিবিষ্ট। সেই সময়ে পিতামহ আমাদিগকে তলব করিলেন। ঐ রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম ও চতুষ্পার্শ্বে ঢাকা, ঢুলিরা বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ছাগশিশুদের সেই কাঁপনি ও ভয়ার্ত্ত আকৃতি দেখিয়া ঐ নৃশংস ভয়াবহ কাণ্ডে যোগ দিতে আর ইচ্ছা হইত না।

বিজয়া দশমীর দিন পল্লীর সমস্ত প্রতিমা নদীতীরে একত্র হইলে সেখানে মেলা বসিল। বালকেরা চাষালোকদের সহিত মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া কতকগুলি ডাকের সাজ প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে সংগ্রহ করিল। প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিয়া, গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোক গ্রামের কালীবাড়ীতে সমবেত হইলেন। সেখানে পরস্পর কোলাকুলি ও প্রণামাদি হইয়া সদ্ভাব প্রদর্শন

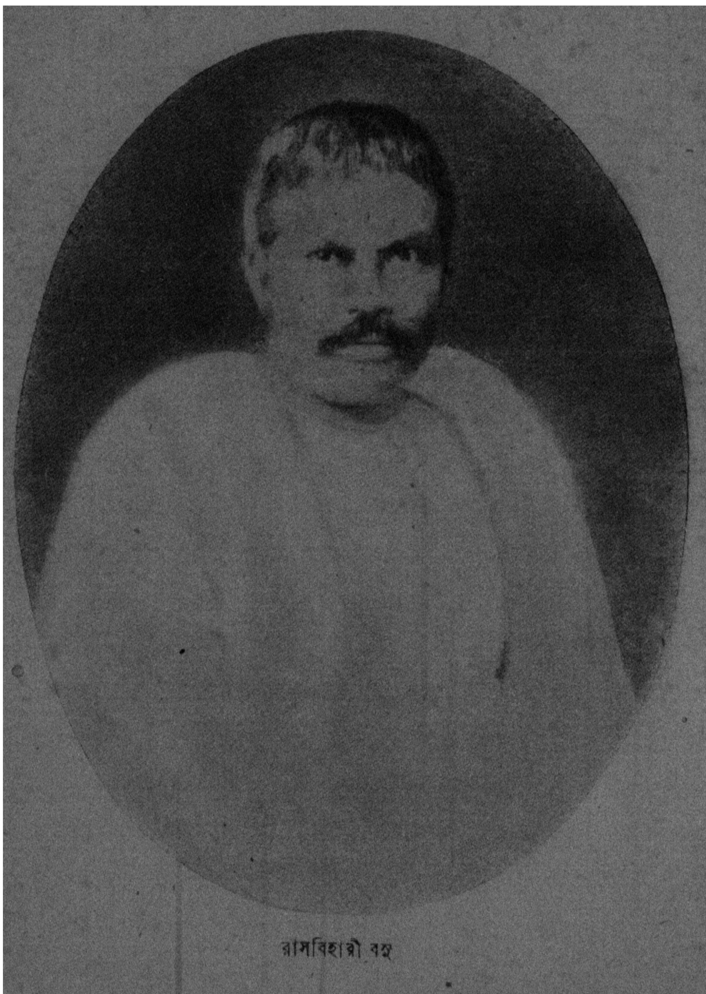
হইল। সে দিন যাহাদের মধ্যে শত্রুতা আছে তাহা বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়তা করা হইল। সেইক্ষণের জন্য শত্রুতা চাপা থাকিল মাত্র।

এইত গেল দুর্গোৎসবের আমোদ। ইহাতে যে ব্যয় হইত তাহাতে ঐ পরিবারের অন্ততঃ পক্ষে তিন মাস সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। কিন্তু দেশের রীতি ও বাহাদুরী করিবার প্রলোভনে পড়িয়া অনেকের অবস্থায় না কুলাইলেও ধার করিয়া ইহা করিতে হইবে। পুরোহিতের মন্ত্রে হয়ত শুনা যাইত 'ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, সুখং দেহি, শত্রুং জহি।' কিন্তু দেখা যায় যে এই আড়ম্বরের খরচে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইত। যে যে গৃহে পূজা সেকালে আমি দেখিয়াছি প্রায় সকল গৃহই এখন জন-হীন বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। চন্দ্র মল্লিক নামে একজন কায়স্থ অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তাঁহার একখানি বাসগৃহ আর একখানি বসুই ঘর মাত্র—দুই-ই খড়ের চাল মাত্র। তিনি বিদেশে জমিদারের গোমস্তাগিরি করিতেন। হঠাৎ কিরূপে জানি না, তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। কিম্বদন্তী এই যে তিনি এক বগুনা টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। বাহিরে দুই তিনখানি ঘর উঠিল। বাটী প্রাচীর বেষ্টিত হইল ও পাকা গৃহ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। একটি পুষ্করিণী কাটিয়া তাহা উৎসর্গ করিতে কিছু ব্যয় হইল। তারপরে দুর্গাপূজা। তাঁহার সংগৃহীত অর্থের যাহা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা এই পূজায় ব্যয় হইয়া গেল। এক বৎসর পরেই যে নিঃস্ব চন্দ্র মল্লিক পূর্ব্বে ছিলেন

আবার তাহাই হইলেন। ১০।১২ বৎসর পরে সে গৃহপ্রাঙ্গণ জঙ্গলাবৃত, তাহাতে আর কেহই থাকিল না।

লোচন ঘোষ নামে এক গোয়ালা বাঁকে করিয়া দুগ্ধ দধি বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। অকস্মাৎ তাহারও কিছু অর্থ সঞ্চয় হইল। তাহার এক কার্য্য মাতৃশ্রাদ্ধ। ঐ কার্য্যে মহাসমারোহ করিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিল। পণ্ডিতগণ আসিয়া দেখিলেন যে নিমন্ত্রণকারী গোয়ালা। তাঁহারা বলিলেন আমরা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, কায়স্থ বুঝিয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। কায়স্থেরা বলিল নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়া বোঝা উচিত ছিল। কায়স্থরা দাস ঘোষ লেখে। নিমন্ত্রণপত্রে নামে দাস নাই, কেবল ঘোষ ছিল। মহাবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। অবশেষে পণ্ডিতগণ যথেষ্ট দক্ষিণা ও সিধা পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পরে দুর্গোৎসব। লোচন খুব ঘটা করিয়া পূজা সম্পন্ন করিল। ব্রাহ্মণদিগকে থালা সহিত চিনির নৈবেদ্য দিল। তাহার পরেই তাহার গৃহ দগ্ধ হইয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইল। এক বৎসর পরে সেই লোচন ঘোষ আবার বাঁক ঘাড়ে করিয়া দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে বাহির হইল।

গ্রামে সে সময় কয়েক বৎসর বারোয়ারী হইয়াছিল। কালী-বাড়ী ৩।৪ খানি বড় বড় চালা ঘর, তাহাতে পুরাণোক্ত সকল দেবতার বিগ্রহ স্থান পাইল। কৃষ্ণনগরের কুমারগণ যাইয়া অতি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া দিল। নানা প্রকার সঙ্‌ও গড়িল। কবির দল ও যাত্রার দল আসিল। গ্রামের লোক টোঙ্গ্ বাঁধিয়া



রাসবিহারী বসু

যাত্রা ও কবি শুনিবার বন্দোবস্ত করিল। ১৪।১৫ দিন নানা উৎসবের পর কার্য্য সম্পন্ন হইল। অবশ্য বারোয়ারী গ্রামের সকলে চাঁদা দিয়া করিয়াছিল কিনা জানি না। পূজা ও আমোদের জন্য এইরূপে বহু ব্যয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রামে একটি মাত্রও রাস্তা ছিল না। বাটী ও জমির সীমানার পগারের পাশ দিয়া হাঁটিবার রাস্তা হইত, তাহাতে কেহ কখনও এক ঝুড়ি মাটি দিত না। বর্ষাকালে এক গৃহ হইতে অপর গৃহে যাইতে জল কাদা পার না হইয়া যাইবার উপায় ছিল না। হাটে বাজারে যাইতে হইলে ক্ষুদ্র নদী বা খাল পার হওয়া সকলেরই আবশ্যক হইত। কিন্তু পার হইবার পুল বা সেতু একেবারেই ছিল না। মধ্যে মধ্যে বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত হইত। অর্থাৎ বাঁশের ফাড়্কা পুঁতিয়া তাহার উপর একখানা বাঁশ নীচে ফেলা থাকিত। আর একখানি বাঁশ উপরে লম্বা বাঁধা থাকিত। একখানি বাঁশের উপর পা রাখিয়া আর একখানি ধরিয়া চলিতে হইবে।

তাহার বহুদিন পরে খুড়ামহাশয় যখন ৪০০।৫০০ টাকা মাহিনা পাইতেন, তখন গ্রামে রাস্তা হইল, সেতু হইল, ইংরাজী স্কুল, বালিকা স্কুল, ডাক ঘর হইল। এ সমস্তই তাঁহার ব্যয়ে ও প্রচেষ্টায়। গ্রামের লোক তাহার প্রতিশোধ দিয়াছিল তাঁহাকে এক ঘরে করিয়া—তাহা পরে প্রকাশ হইবে।

সংযুক্ত পরিবার

আমাদের গ্রামে ৫।৬ ঘর ব্রাহ্মণ ও ৪০।৫০ ঘর কায়স্থের বাস ছিল। ব্রাহ্মণগণ সকলেই গরীব, পৌরোহিত্য ব্যবসা করিতেন ও সামান্য জমা জমি ছিল, তাহার উৎপন্ন ভোগ করিতেন। কায়স্থদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে চাকরি করিতেন। চাকরি প্রায়ই যৎসামান্য। তবে দারোগা, নায়েব, জমিদারের ও কালেক্টরীর আমলা কেহ কেহ ছিলেন। কেবল খুড়া মহাশয় মুন্‌সেফ্‌ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

সংযুক্ত পরিবার চল্‌তি থাকাতে প্রত্যেক গৃহের একজন চাকরি করিত আর সকলে প্রায়ই গৃহে কিছুই করিত না। সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রাম সকল ভ্রমণ করিয়া কিছু তরকারী উপার্জ্জন করা ভিন্ন আর কিছু দেখিতাম না। তবে দুই চার জন কর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিপ লইয়া মাছ ধরিত। আর সকলেই দুপুর বেলায় আহারাদি ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাস, পাশা, দাবা লইয়া বসিত। সন্ধ্যার পর যে যাহার গৃহে যাইয়া বসিত। রাত্রে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ অতি বিরল ছিল।

সংসারের কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তে—গৃহ সংস্কার, লেপা, পরিষ্কার রাখা, রন্ধন, পরিবেশন, সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ ও শুশ্রূষা, চাউল, ডাইল প্রস্তুত করা, বড়ি, আমসি, আমসত্ত্ব, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করা, গৃহের জল সংগ্রহ, তৈজসপত্র

পরিষ্কার করা সমস্তই স্ত্রীলোকের কার্য্য। পুরুষেরা অবশ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বাধ্য।

সংযুক্ত পরিবারের প্রধান দোষ কলহ। স্ত্রীলোকদিগের পরস্পর মিল প্রায়ই হয় না। সামান্য কথা বা দ্রব্যাদি লইয়া বিবাদ লাগাইয়া দেয়। সকলেই সাধারণ আহার প্রাপ্ত হয়। নিতান্ত শিশু ভিন্ন কেহই দুইবারের অধিক আহার পাইতেন না। একবার বেলা দুপুরের সময় আর একবার রাত্রে। পার্ব্বণ ভিন্ন অন্য সময়ে সাধারণতঃ আহারও যৎসামান্য। ভাত, ডাল ও একটা তরকারী। মধ্যে মধ্যে মৎস্য পাওয়া যাইত, প্রত্যহ নহে। দুগ্ধ শিশুরা ও নিতান্ত বৃদ্ধেরা পাইতেন। ঘৃত অতি বিরল, কদাচ কখনও দেখা যাইত। সকালে ও বিকালে কিছু জলযোগ করিবার নিয়ম ছিল না। গৃহের পুরুষদিগের আহার এইরূপ ছিল। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের পরিবেশন করিয়া যাহা থাকিত তাহাই পাইতেন। প্রায় অনেক সময়ে ডাল, তরকারী, মৎস্য ফুরাইয়া যাইত। তাঁহাদের অবলম্বন তেঁতুল ও লবণ। এরূপ আহার দ্বারা জীবনী শক্তি কতদূর প্রবল থাকে তাহা বলা কঠিন। জ্বর রোগের যে এত প্রাদুর্ভাব ছিল জীবনী শক্তির ক্ষীণতা বোধ হয় তাহার এক প্রধান কারণ। উর্ব্বরা ও উষর ক্ষেত্রের ফসল তুলনা করিলেই বুঝা যায় যে উর্ব্বরা ক্ষেত্রের ওষধি সকল সতেজ ও ফলপ্রদ, শেষোক্ত ক্ষেত্রের গুল্মাদি ক্ষীণ, স্বল্পায়ু ও কীটদষ্ট। উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণে আহারীয় বস্তু থাকিলে জমি উর্ব্বরা হয়।

আহারের বিষয় বলা হইল, এখন পোষাকের কথা বলিব। গ্রামের যুগীরা কাপড় বুনিত। মোটা সূতা বোধ হয় এখনকার ২০ বা ৪০ নম্বর, একখানি ধুতি প্রায় হাঁটুর নীচে পড়িত না। জুতা অতি অল্পই ব্যবহার হইত। পূজার সময় এক জোড়া পাওয়া যাইত। চাদরও তাই। পূজার সময় একখানি ভাল ধুতি, চাদর ও জুতা পাওয়া যাইত। এই জুতা ও চাদব বিশেষ শোভার জন্য ব্যবহাব হইত। সাধারণতঃ খালি পায়ে গমনাগমন ছিল। বাটীর কর্ত্তাবা খড়ম পায়ে দিতেন। বৃদ্ধদেব এক জোড়া চটী থাকিত। কাটা কাপড, জামা, কোট প্রায়ই ব্যবহার ছিল না। যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন তাঁহারা মির্জ্জাই বা আঙ্গ্‌রাখা পরিতেন। শীতকালের জন্য মোটা চাদর বা দোলাই। কদাচিৎ কেহ একখানা রাঙ্গা বনাত ব্যবহার করিত। কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে মোজা কখনও দেখি নাই। স্ত্রীলোকদিগের এক সাড়ী মাত্র অবলম্বন। তাঁহাবা শীত নিবারক গাত্রবস্ত্র পাইতেন না বা ব্যবহাব করিতেন না। বাসগৃহ সাধারণতঃ খড়ের কুটীর। ইষ্টকালয় অতি বিরল। যে গ্রামে ২।৩ খানা ইষ্টকালয় দেখা যাইত সে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া পরিগণিত হইত। অনেক গ্রামে সঙ্গতিশালী লোক থাকিলেও তাহাদের ইঁট পোড়াইতে নাই এরূপ সংস্কার ছিল। পূর্ব্বকালে ইষ্টকালয় করিতে হইলে সরকার (গভর্ণমেণ্ট) হইতে হুকুমনামা আবশ্যক হইত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজা কুমিল্লানগরে ইষ্টকালয় করিতে দিতেন না। পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই

এইরূপ ছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আমল হইলেও বহুদিন লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল। এক্ষণে ক্ষুদ্র নগরে যত পাকা দালান দেখা যায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত জেলা খুঁজিলেও ততগুলি দেখা যাইত না।

নব্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায বলিলেন যে আমরা ক্রমে নির্ধন হইতেছি। গভর্ণমেণ্টেব কূট অর্থনীতি আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। দেশীয় সমস্ত অর্থ বিলাতে ভাসিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফল দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ও প্লেগ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের গৃহাদি, পোষাক ও আহার কত অধিক মূল্যবান্ হইয়াছে তাঁহাবা যদি অনুধাবন করেন তাহা হইলে এ আবদার করিতেন না। ইউরোপীয়গণ হইতে যে আমরা দরিদ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমবা পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়াছি এ কথা কি সঙ্গত ?

স্ত্রীশিক্ষা

সেকালে স্ত্রীলোকেবা লেখা পড়া শিখিত না। মেয়েদের পাঠশালে যাওয়া রীতি ছিল না। তাহারা কিছু কিছু শিল্প শিখিত। কাঁথা, মশারী, ব্যাটন, ওয়াড় প্রভৃতি সেলাই, মাটি বা পাথরে ছাঁচ (dies) প্রস্তুত, শিকা ও চুলেব দড়ি বোনা, এই সকল শিল্প অনেকে জানিতেন। এখন সেলাই ও বুনানর কার্য্যের

শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ছাঁচ প্রস্তুত উঠিয়া গিয়াছে। ঐ ছাঁচে মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও আমসত্ত্ব দেওয়া হইত। একটি নরুন দিয়া পাথর কাটিয়া ছাঁচ প্রস্তুত করা অনেক কাল অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ। ১৮৫৫।৫৬ সালে খুড়া মহাশয় পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া মাতা, খুড়ী ও জ্যেঠিমাতাদিগকে লেখাপড়া শিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও পারিতোষিক প্রাপ্তির আশায় অনেকেই শিখিতে আরম্ভ করিলেন। পল্লীর মহিলাগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা শিখিয়া ফেলিলেন। রামায়ণ, মহাভারত তাঁহাদের অবসরের সহায় ও আনন্দেব খনি হইয়া উঠিল। তাহার ৮।১০ বৎসর পরে খুড়া মহাশয় গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিলেন।

বিধবা

আমার এক খুড়ী ছিলেন, তিনি বালবিধবা ও নিঃসন্তান। তিনি আমাদের দ্বিতীয় মাতা স্বরূপ। আমাদের গর্ভধারিণীর সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন ও আমাদের সঙ্গে এক ঘরে বাস করিতেন। আমার মাতাও বিধবা হইলে, আমরা পাঁচ সহোদর ও এক সহোদরা খুড়িমাতাকে মা বলিয়াই জানিতাম। বিধবাদের অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য এ কথার অবতারণা করিলাম। তাঁহারা

একাহারী, একবেলা অন্ন আহার। রাত্রে জলযোগ করিতে তাঁহাদের নিষেধ ছিল না, কিন্তু রাত্রে তাঁহারা কিছুই আহারীয় পাইতেন না। কেবল দুপুর বেলায় ডাইল, তরকারি ও ভাত। দুগ্ধ ঘৃত পাইতেন না। যদি কখনও দুগ্ধ পাইতেন তাহা হইলে আমরা যাইয়া ভাগ লইতাম। আমাদের দেশে কায়স্থ বিধবারা নির্জলা একাদশী করেন না। তাঁহারা অন্ন পাইতেন না। আর কি পাইবেন? অগ্নিপক্ক কোন দ্রব্য খাইতেন না, কখনও একটু গুড় বা বাতাসা ও ভিজা চাউল। এক এক দিন নারিকেল ও ভিজা চাউল গুড় বা চিনির সহিত মিশাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া ক্ষুদ্র নাড়ু বানাইতেন। তাহাতে অবশ্য আমরাও ভাগ বসাইতাম। যতটুকু নারিকেল পাইতেন তাহাতে এক একজন বিধবার এক এক ছটাক নাড়ু প্রস্তুত হইতে পাবে। এইমাত্র আহারে সন্তুষ্ট হইয়া বিধবারা সংসারের কার্য্য, স্বজন প্রতিপালন, রুগ্ন সন্তানগণের শুশ্রূষা অম্লান বদনে সম্পন্ন করিতেন। এখনকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে উহা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা বলিয়া সকলেরই মনে হইবে। কিন্তু তখন আমরা কেহ তাহা ভাবি নাই, মনেও করি নাই। একদিন ঐ কথা সবলে মনে আনিয়া দিয়াছিল। একাদশীর পরদিন সকাল বেলা ৯।১০ টাব সময় আমরা তিন চারজন রুগ্ন সন্তান অন্নপথ্য কবিব। মাতা মৎস্যের ঝোল ও ভাত রাঁধিয়া আমাদের খাওয়াইতেছেন, এমন সময়ে আমার কনিষ্ঠ বলিল, কাঁঠালের বীচি ভাতে মাখিবার জন্য তেল দাও। কাঁচা তেল অপথ্য। ক্ষুদ্র

বালক ক্রন্দন আরম্ভ করিল, কিছুতেই ছাড়িবে না। তেল যে ঘরে থাকিত সে খানিক দূর, দুইটা উঠান পার হইয়া যাইতে হয়। মাতা তেল আনিতে ছুটিলেন। অনশনে শরীর দুর্ব্বল, আসিবার সময় পায়ে হুঁচট্ লাগিয়া ধরাশায়ী হইলেন। নাক মুখ কাটিয়া গেল, রক্তারক্তি ও অৰ্দ্ধ অচেতন। দুঃখে মাতার চক্ষে জলধারা ছুটিল। সে দৃশ্য মনে হইয়া এখন আমার চক্ষে জল আসিতেছে। আর থাক্।

রোগ চিকিৎসা

৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত আমাদের গৃহে ১২।১৪ জন বালকবালিকা ছিল। গৃহ হইতে জ্বরেব প্রায় অন্তর্ধান হইত না। বিশেষ বর্ষা ও শরৎকালে এই রোগেব প্রবল প্রাচুর্ভাব। কলেরা ও বসন্ত গ্রামে কখনই দেখা যাইত না। আমাদের নিজ গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে চিকিৎসক ছিল না। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য ছিল না। একজন কায়স্থ চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। বৈদ্যশাস্ত্রে তাঁহার কোন পার-দর্শিতা ছিল বোধ হয় না। খাতাপত্র ছিল, ৪।৫ টা ঔষধ প্রস্তুত করিতেন ও পাচনের ব্যবস্থা করিতেন। আমার ত বার মাস মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। সাধারণ জ্বর অষ্টাহের কমে সারিত না। কবিরাজ মহাশয় বলিতেন অষ্টাহ না গেলে রস

পরিপাক হয় না। বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ। সাধারণতঃ অষ্টাদশন পাচন ও রাঙ্গা বড়ি ব্যবস্থা। এক সপ্তাহের অধিক স্থায়ী হইলে তখন মকরধ্বজ প্রভৃতি বিধান হইত। পথ্য সামান্য জ্বরে খৈ ও মধু। অধিক জ্বরে মুগ, মশুরের জুস্। কিন্তু প্রধান দুঃখের বিষয় এই যে কবিরাজ মহাশয়দের জলের প্রতি মহা আক্রোশ, তৃষ্ণায় রোগী ছট্‌ফট্ করিতেছে, যাহাকে দেখিতেছে তাহাকে অনুনয় বিনয় করিতেছে "ওগো, একটু জল দাও।" হাঁড়িতে জল জ্বাল দেওয়া থাকিত, তাহা হইতে এক ঝিনুক জলের অধিক একবারে দিবার নিয়ম নাই। তাহাও বহুক্ষণ পরে। সে কষ্ট কখনও ভুলিবার নহে। এখন দেখিতেছি জ্বরের প্রকোপের সময় ঠাণ্ডা জল ইচ্ছামত পান করিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। জ্বর ভিন্ন অন্য রোগে কবিরাজ আসিতেন না। পেটের অসুখ হইলে পিতামহী চিকিৎসা করিতেন। তিনি দুই প্রকার বড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন; তাহাতে যে কোন উদরাময় শীঘ্র উপশম হইত। ১৮৫৮ সালে দেশে কুইনাইনের আবির্ভাব হয়। এক ব্যক্তি এক শিশি কুইনাইন রাখিতেন ও এক এক বড়ি এক আনা মূল্যে বেচিতেন। তাহার ৪।৫ বৎসর পরে বড় বড় গণ্ডগ্রামে ও বাজারে ডাক্তারদিগের অধিষ্ঠান হইল। তাহারা allopathy শাস্ত্র কিছুই জানিত না, কোন পুস্তকও পড়ে নাই। কোন ডাক্তারের compounder ছিল অথবা ঐ compounder-এর শিষ্য। তাহারা কতকগুলি বোতল, ২।৪ টা অ্যাসিড্,

সোডা ও কুইনাইন লইয়া বেশ জাঁক করিয়া বসিল—তাহারা পাল্কী ভিন্ন কোথায়ও যায় না। তাহাদের বাগাড়ম্বর, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা ইংরাজী বড় বড় কথা, শুনিয়া লোকের তাক লাগিয়া যাইত। কবিরাজকে লোকে প্রায়ই টাকা দিত না, তিনি অতি কষ্টে ২।৪ টাকা আদায় করিতেন। কিন্তু এই মূর্খ ডাক্তারগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিত। অদ্যাপি এই নিয়ম, এখন শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ও পাশ করা ডাক্তার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরাজগণ অত্যল্প শ্রদ্ধা আকষণ করেন। তাহার এক কারণ বোধ হয় কবিরাজগণ যে ঔষধ দেন তাহা প্রায়ই শাস্ত্রমত সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত নহে, ইহা একটী সাধারণ ধারণা। অট্টালিকা চূর্ণ, দগ্ধ কাষ্ঠেব গুঁড়া প্রভৃতি শ্লেষ বাক্য তাঁহাদের ঔষধের প্রাত প্রযোগ হয়। ডাক্তারের মধ্যে যে অধিক হাঙ্গামা করিতে পারে তাহারই প্রতিপত্তি শীঘ্র হয়। যে ঔষধ দুষ্প্রাপ্য তাহাই বিধান করা, মুহুর্ম্মুহু ঔষধ পরিবর্ত্তন, নানা প্রকার যন্ত্র প্রয়োগ, অদ্ভুত পথ্যের ব্যবস্থা, তাঁহারাই সাধারণ লোকের মধ্যে যশস্বী হন। লোকটা মরিয়া গেল বটে, তাতে ডাক্তারের অপরাধ নাই। ডাক্তাব ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ দিয়াছে, ও নানা প্রকার ফরমাইস কারয়াছিল। আইদ্দি (আয়ু) না থাকিলে কে বাঁচাইতে পারে।

বিনা কারণে রোগ জন্মে না, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে রোগের উৎপত্তি। সাধারণ নিয়মগুলি সকলেই জানেন। ভিজা কাপড়ে বা ভিজা পায়ে বহুক্ষণ থাকিলে, ঠাণ্ডা ভোগ করিলে,

নানাপ্রকার রোগ হয়। কেহ জ্ঞাত কারণে রুগ্ন হইলে সকলে তাহাকে অনুযোগ করে। কিন্তু অনেক কারণ আছে যাহা সাধারণতঃ অজ্ঞাত। সকল রোগ ব্যক্তিগত অপরাধে জন্মে না, অনেক ব্যাধি সামাজিক বা সাধারণ লোকের অপরাধে জন্মে। যেমন পানীয় জল দূষিত করা, গ্রামে জঙ্গল হইতে দেওয়া, বাজার, পথ ঘাট, ও গৃহপ্রাঙ্গণ ময়লা আবর্জ্জনা পূর্ণ রাখা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ বলিতে হইবে। এগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু কাহারও প্রতি দোষ আরোপ করা আমাদের স্বধর্ম্ম। এইজন্য ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা, ভগবান্ আছেন সকল দোষ তাঁহারই। এ সকল রোগ নিবারণ করিতে হইলে সকলের প্রচেষ্টা আবশ্যক। দেশের পনের আনা লোক মূর্খ, তাহারা রোগের কারণ অবগত নহে। আবার পরস্পর ঐক্য না থাকিলেও কোন প্রকার প্রতিবিধান করা সম্ভব নহে। নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন আপাততঃ দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। সংক্রামক রোগ, মহামারী এখন নূতন নহে। এদেশে শত শত বৎসর চলিতেছে। কত নগর ও পল্লী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বপুরুষগণ স্থানত্যাগ ভিন্ন অন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

সাধারণ লোকের শিক্ষা ও ঐক্য এই বিপদের কেবল এক মাত্র প্রতিষেধক। বাস্তবিক এই দুইটী সমাজের উন্নতির মূল মন্ত্র। অশিক্ষার মূলে পৌরোহিত্যের বেড়ি এবং অনৈক্য জাতি-ভেদের বিষময় ফল। শত শত নগর এবং পল্লী যে নির্জন

জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা দেশ ভ্রমণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই বাঙ্‌লাদেশে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দেশের ইতিহাস নাই। যতটুকু জানা যায় হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গৌড়, অযোধ্যা প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ ও সুবৃহৎ নগরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়। এই সকল ধ্বংসের কারণ সংক্রামক রোগ ও মহামারী। মহামারী নিবারণ করিবার চেষ্টা কখনও হয় নাই। স্থানত্যাগ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এখন ইংরাজ আমলে Municipality প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের চেষ্টায় অনেক নগরের উন্নতি দেখা যাইতেছে। Municipality বলপূর্ব্বক ঐক্য স্থাপন করে, ও সুশিক্ষিত কর্ম্মচারী দ্বারা চালিত হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই। হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সাধারণ লোক যদি কখনও শিক্ষিত হয় আর যদি ভগবানের কৃপায় একতা করা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া লোকের মধ্যে পরিগণিত হয় তখনই এই সুফল ফলিতে পারে।

গ্রাম্য নীতি

আমাদের গ্রামে মারামারি বা চুরি ডাকাতি প্রায় হইত না। মদ্যপান গ্রামে একেবারেই ছিল না। কেহ কখনও মদ খাইয়াছে শুনিও নাই, দেখিও নাই। এক জ্যেঠা মহাশয় ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করিতাম না। তিনি সামান্য কারণে বা বিনা

কারণে প্রহার করিতেন। দুই বালক কলহ করিয়াছে, তিনি নিকটে থাকিলে দুই জনই প্রচুর শাস্তি পাইল। বর্ষাকালে পিছিল উঠানে কেহ পাড়িয়া গেল, সেও প্রহার পাইল। আমরা দৌড়াদৌড়ি খেলিতেছি, তিনি দেখিলেই প্রহার। আম গাছে উঠিয়াছি অথবা খেজুর গাছের রস পাড়িয়াছি তিনি দেখিলেই সর্ব্বনাশ। তথাপি জ্যৈষ্ঠ মাসে আম গাছে ওঠা ও শীতকালে খেজুর গাছে উঠিয়া রস খাওয়া আমাদের নিত্য কর্ম্ম ছিল। অপরের উদ্যানের আম্র চুরি ও রস চুরি অনেক করিতাম। আমরা চুরি করিয়া রস খাইতাম মাত্র। কিন্তু একজন গরীব কায়স্থ রাত্রে অনেক রস চুরি করিয়া আনিত। সকালে তাহার বাড়ীতে গেলে দেখা যাইত ২।৩ খোলা রস জ্বাল দিয়া গুড় বানাইতেছে। একদল যুবা পুরুষ ছিল তাহারা সকলেই নিরক্ষর মূর্খ, তাহারা নারিকেল, কাঁঠাল, গুবাক (সুপারি) লাউ, কুমড়া, ধান শসা প্রভৃতি সর্ব্বদা চুরি করিত। নষ্টচন্দ্রের দিন রাত্রে লাউ, কুমড়া, শসা ও ধান চুরি করা বাহাদুরীর মধ্যে পরিগণিত ছিল। রাত্রে কাঁচা ধান চুরি করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে আনিয়া চিড়া প্রস্তুত হইত। এসকল কার্য্যে আমরা কখনও লিপ্ত হই নাই; কিন্তু ঐরূপে প্রস্তুত কাঁচা চিড়া কখনও কখনও খাইয়াছি। বোধ হয় এসকল কার্য্য কেহ গ্রাহ্যযোগ্য মনে করিত না। নিবারণ করিবারও বিশেষ চেষ্টা করিত না। সে সময় গ্রামে দলাদলি দেখি নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে দলাদলি আরম্ভ হয়। তাহা পরে বলা যাইবে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থে সদ্ভাব ছিল। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগৃহে নিমন্ত্রণ হইলে লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন ভোজ পাইতেন। কেবল আমাদের নিজগ্রামের পুরোহিত আসিতেন এমন নহে। আল্‌তাপোলের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা জমিদার ও ঐ অঞ্চলের মান্যগণ্য, তাঁহারাও নিমন্ত্রণে আসিতে দ্বিধা করিতেন না।

কৃষ্ণনগরে আসিয়া প্রথম দেখিলাম ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগকে হেয় মনে করেন, তাঁহাদের গৃহে আহার করেন না। কাল-ক্রমে এই অভিমান কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি একেবারে বোধ হয় যায় নাই। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান, এখানে অন্য স্থানের অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য অধিক। জাতি মান কতকাংশে অর্থের অপেক্ষা নিশ্চয়ই রাখে। আমাদের নিজগ্রামে দুইঘর কায়স্থ ছিলেন। এক ঘর কুলীন বংশজ ও আর একঘর মৌলিক। দুই ঘরই গরীব ও বোধ হয় ক্রিয়া-কর্ম্মে হীন। তাঁহারা গ্রামের অন্যান্য কায়স্থদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতেন না। তাঁহারাও ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রিত হইতেন, কিন্তু ভিন্ন স্থানে বসিতেন।

আর কতকগুলি যুগী ছিল, তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা জল আচরণীয় ছিল না। বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল।

গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ছিল ও নিকটস্থ সমস্ত গ্রামেই মুসলমান ভিন্ন হিন্দু প্রায়ই ছিল না। চাষ কার্য্য সমস্তই মুসল-

মানের হস্তে। ২।৪ জন মুসলমান ছাত্র পাঠশালায় আসিত। পূজার সময় মুসলমান বালকবালিকাগণ নূতন পরিচ্ছদে আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিত ও জলপান পাইত। সে সময়ে মুসলমানগণ আমাদের গৃহে আহার করিত। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে তাহারা হিন্দুর গৃহে আহার ত্যাগ করিল। ক্রমে মৌলভীদিগের প্ররোচনায় ঐ অঞ্চলের মুসলমানগণ গোঁড়ামি শিখিল। হিন্দুদের সহিত পূর্ব্বে যেরূপ সদ্ভাব ছিল তাহাও ক্রমে লয় পাইল। একদিন চিল্‌তা লিখিবার জন্য পাতা কাটিতে গিয়াছি, সঙ্গে এক বালক মুসলমান ভৃত্য ছিল। দুই জনে এক চাষী মুসলমানের কলা বাগানে পাতা কাটিতেছি এমন সময়ে এক যুবা পুরুষ 'দা'হস্তে আসিয়া উগ্রমূর্ত্তি হইয়া আমাদিগকে বকিল ও রাগ করিয়া চট্‌পট্‌ কতকগুলি চারাগাছ কাটিয়া ফেলিল। আমি ত ভয়ে পাতা ফেলিয়া পলাইতে উদ্যত, এমন সময় দুইটি প্রৌঢ়া মুসলমানী বাগানে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল 'ও গোঁয়ার জামাই, নতুন আসিয়াছে, ওর কথা শোনার দরকার নাই।' তখন সে পলাইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা আমায় পাতা কাটিতে ও বাঁধিতে সাহায্য করিল।

সে সময় হিন্দু মুসলমানে কোন প্রকার অসদ্ভাব ছিল না। আমাদের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে হিন্দু চাষী ছিল না, অনেক গৃহস্থালী কার্য্যে মুসলমানের সাহায্য প্রয়োজন হইত। বাটীর সকলের সঙ্গে অনেক মুসলমানের সম্পর্ক পাতান থাকিত। তাহারাও হিন্দুদের সংস্কার বজায় রাখিয়া চলিত।

বিদেশ যাত্রা

যখন খুড়া মহাশয় মুন্‌সেফ্‌ হইয়া ফরিদপুরে আসিলেন সেই সময় ১৮৫৪ সালে তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে ইংরাজি স্কুলে পড়িবার জন্য সেখানে লইয়া গেলেন: আমার যখন আট বৎসর বয়স হইল তখনও আমাকে লইলেন না। আমার জ্যেঠা-মহাশয়ের এক শ্বশুরবাড়ী ছিল আলকামূর্ত্তীশ্বরী। সেখানে অল্পদিনের জন্য একজন ইংরাজী শিক্ষক স্কুল স্থাপন করিল। জ্যেঠা মহাশয় ইংরাজী পড়িবার জন্য আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। সে মাষ্টার একমাস পরে চলিয়া গেল। আমার ইংরাজী বর্ণপরিচয় মাত্র শিক্ষা হইল।

১৮৫৭ সালে অক্টোবর মাসে জ্যেষ্ঠদিগের সহিত ফরিদপুর গিয়াছিলাম। নৌকায় যাইতে ১১ দিন লাগিয়াছিল। সেখানে আমি বাঙ্গলা স্কুলে প্রবেশ করিলাম। পরে ভাদ্র মাসে খুড়া মহাশয় হুগলী জেলার জাহানাবাদে বদ্‌লি হইলেন। আমরাও গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরে '৫৯ সালের আষাঢ় মাসে যশোহর যাই। সেখানে একমাস মাত্র থাকিয়া জ্বর হইয়া চলিয়া আসিলাম। আবার '৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যশোহরে গেলাম। খুড়া মহাশয় খরচ পাঠাইতেন। সে টাকা অন্য এক-জনের নিকট থাকিত। আমরা ছয় জন একগৃহের বালক একটি বাটীতে থাকিতাম। দুইখানি ক্ষুদ্র কুটীর। একখানিতে থাকা,

আর একখানিতে রান্না হইত। আমাদের ছয় জনের মধ্যে তিন বয়োজ্যেষ্ঠ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, আর তিন জনের স্কুলের মাহিনা এক টাকা করিয়া লাগিত, তাহা না দেওয়াতে আমরা স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই। অগ্রজ তিন জন 3rd ও 4th ক্লাসে পড়েন, তাঁহারা আমাদিগকে পড়াইবেন এই কথা ছিল। সে পড়া নামমাত্র। ক্ষুধায় অস্থির, তার পড়ায় বা কে, পড়ে বা কে? দুই বেলা অন্ন পাইতাম এই মাত্র। বিকালে ক্ষুধায় অধিক যন্ত্রণা হইত। অনেক দরবার করিয়া এক পয়সা জলখাবার আদায় করিতাম। আমরা ছয় জন, পয়সা মাত্র একটী। পাকা ডয়রা বা বিচে কলা পয়সায় ৭।৮ টা পাওয়া যাইত, তাই ভাগ করিয়া খাইতাম। এইরূপে চার পাঁচ মাস কাটিল। চৈত্র মাসে আমার জ্বর হইল। একদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি বাবু শিশিরকুমার ঘোষ (বিখ্যাত অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক) আসিযা বসিলেন ও আমার এক জ্যেঠতুত ভাই যিনি শয়নাবস্থায় ছিলেন তাঁহার বাহু একখানি ছুরিকা দিয়া খানিক চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম কিছুমাত্র রক্ত নির্গত হইল না, তাহাতে ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। সে সময় লোকের বিশ্বাস ছিল vaccine inoculation বা টীকা দিলে কলেরা আরোগ্য হয। আমরা আব সকলে তৎক্ষণাৎ যশোহর ত্যাগ করিলাম। ঐ ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

কলিকাতা

১৮৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে আমরা কলিকাতায় গেলাম। সেখানে আমি সংস্কৃত কলেজের স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। প্রথম বৎসর দুই ক্লাস উত্তীর্ণ হইলাম। তার পরের ক্লাসে কিছু কিছু ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। ঋজুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ পাঠ শেষ হইলে রঘুবংশ তারপর কুমারসম্ভব তারপর ভারবীর ক্লাসে উঠিয়া স্কুল ত্যাগ করিলাম। দেখিলাম যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ যাহারা ইংরাজি স্কুলে পড়ে তাহারা আমাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এই জন্য সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিলাম। ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৪ বৎসর ছিলাম।

সে সময়ের কলিকাতার বর্ণনা প্রয়োজন হইতেছে। কারণ সে কলিকাতা এখন আর নাই। সে কি কদর্য্য, ময়লা, দুর্গন্ধময় স্থান তাহা যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। নর্দ্দমা সকল রাস্তার পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পূতিগন্ধ তরল পদার্থে পূর্ণ। কোন পথে জলসেচন প্রণালী ছিল না। বৃষ্টি হইলে ৫।৬ ইঞ্চি কাদা আর বৃষ্টি না হইলে ধূলায় অন্ধকার। কলেজ হইতে আসিবার সময় দেখিতাম কলেজ বা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ ধূলা উড়িয়া এমন অন্ধকার হইয়াছে যে ৪।৫ হাত তফাতে

কিছুই দেখা যায় না। গলিপথে যদিও অত ধূলা নাই কিন্তু এমন দুর্গন্ধ যে নাকে কাপড় দিয়াও নিবারণ করা যায় না, হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। পানীয় জলের অভাব। কোন কোন ধনী লোকের গৃহে রক্ষিত পুষ্করিণী থাকিত, তাহা হইতে জল আনিতে হইত। স্নানের জন্য সাধারণ পুষ্করিণী ভুরি ভুরি ছিল। কিন্তু সে জলে অবগাহন করিতে হইলে চক্ষু বুজিয়া করাই ভাল, কারণ সে জল প্রায় নীল বর্ণ ও নানা প্রকার কীট পতঙ্গ ভাসিতেছে দেখা যাইত।

কলিকাতার স্বাস্থ্য সে সময় তদনুরূপ খারাপ ছিল। কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, জ্বর অনেক হইত। তখন জ্বরের এক অদ্ভুত চিকিৎসা দেখিয়াছিলাম। একবার দাদা ও গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর উভয়েরই এক সময়ে জ্বর হইল। এক ডাক্তার আসিয়া তাঁহাদের রগে জোঁক বসাইয়া দিল, এক এক জনেব দুইটী জোঁক। জলৌকাগুলি রক্ত খাইয়া যখন যথেষ্ট স্ফাত হইল তখন তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া গেল। বাঙ্গলা Medical School এব ছাত্রেরা মুখস্থ করিত

মাথাধরা যুক্ত জ্বর,
জোঁক, জোলাপ, জলপটী।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ দাদার সহপাঠী, একত্র ১৮৬১ সালে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও তিনি Medical Collegeএ প্রবেশ

করেন। তাঁহার মত সদাশয় নীতিপরায়ণ লোক দেশে অতি বিরল। অতি মিষ্টভাষী ও অস্বার্থপর, তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত। ঐ সময় তিনি বিবাহ করিলেন ও কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীকেও ঐ বাসায় আনিলেন। শ্রীমতী জগৎ তারিণী দেবী স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী। তাঁহাকে আমি পড়াইতাম। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন না, কিন্তু অতি সরল প্রকৃতি, কোনরূপ কপটতা তাঁহার মনে আসিত না। হিন্দুয়ানীর কুসংস্কারগুলির উপর গঙ্গাপ্রসাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। স্ত্রীও স্বামীর সম্পূর্ণ সহধর্ম্মিণী। তিনি গৃহস্থালী কার্য্য জানিতেন না। যে দিন পাচক অনুপস্থিত হইত আমরা রাঁধিতাম। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। আমাদের খোস হইয়াছিল, তিনি প্রত্যহ সকালে গরম জল ও ছুঁচ লইয়া আসিয়া আমাদের স্ফোটকগুলি পরিষ্কার করিতে বসিতেন। আমার এক রোগ ছিল, আমি স্ত্রীলোকের স্পর্শ সহিতে পারিতাম না, এজন্য আমি নিজে পরিষ্কার করিতাম, কিন্তু অন্য ভ্রাতাদের খোস তিনি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন। গরমের সময় স্কুল হইতে আসিলে একখানা পাখা হাতে উপস্থিত হইতেন ও বাতাস করিতেন। একবার আমার পানিবসন্ত হইয়া প্রায় ১৫ দিন শয্যাগত ছিলাম। তিনি সমস্ত দিবস আমার নিকটে বসিয়া গল্প করিতেন ও আমার পথ্য প্রস্তুত করিতেন। তিনি আমার সমবয়স্কা ছিলেন বোধ হয়। তথাপি তিনি তখন যুবতী,

আমি বালক। আমার সকল ভ্রাতাদের সহিত ঐরূপ মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তাহা যে কিছু অসামাজিক বা নিয়ম বিরুদ্ধ এরূপ ভাব তাঁহার কখনই মনে হইত না। তাহার অনেক দিন পরে আমি যখন যুবা হইয়াছি তখনও তাঁহার গৃহে গেলে সেইরূপ বাল্যকালের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তখন আমার কেমন সঙ্কোচ হইত, কিন্তু তাঁহার হইত না।

ইহার বহুদিন পরে যখন আমাদের গৃহের মহিলাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তিনি কখনও কখনও কৃষ্ণনগরে আসিয়া দাদার গৃহে কিছুদিন প্রবাস করিতেন। আমি তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিতাম, তাহা শুনিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বলিতেন— তাঁহার লজ্জা সরম নাই, সাংসারিক কোন কাজ করিতে পারেন না, তাঁহার আবার প্রশংসা কি? কিন্তু তাঁহার সরলতার জন্য সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা প্রশংসা করুন আর নাই করুন এই চির বালচিত্ত মহিলারই পুত্র বাঙ্গালা-দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পণ্ডিত ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ধীর ও প্রবল চিত্তের লোক ছিলেন। কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম্ম Religion বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্যজ্ঞানে কঠোর, আবার অত্যন্ত সদয় ও অস্বার্থপর। ব্যারাম হইলে আমি অথবা ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেন। আমার কনিষ্ঠ সহোদর কেশব B. L. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে ২।৩ মাস মাতার

সহিত বাস করিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যথেস্ট শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এই দম্পতির কথা উঠিলে মনে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয় তাহা সমস্ত প্রকাশ করিয়া ওঠা দুঃসাধ্য।

তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পুত্রদের বাল্যাবস্থায় নিজে প্রত্যহ প্রত্যূষে ৫টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া পুত্রদিগকে উঠাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে ব্যায়াম করিতে যাইতেন। নিজেও তাহাদের সহিত ব্যায়াম না করিলে যদি তাহারা মনোযোগ না দেয় এজন্য নিজেও করিতেন। পরে শরীর প্রক্ষালন করিয়া প্রাতরাশ হইল। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষক আসিল। দুই তিনজন শিক্ষক থাকিত, একজন ইংরাজি, একজন সংস্কৃত ও একজন অঙ্ক শিখাইত। কিন্তু আসল শিক্ষক স্বয়ং। তাঁহারা কেবল সহকারী মাত্র। ডাক্তারের কার্য্যে রোগী দেখিতে বাহির হইলেন। এক একবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কে কি পড়িতেছে, কিরূপ পড়িতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। গৃহ-শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যত্ন করে না, হয়ত নিজেরা বকিয়া যায়, ছাত্র মন দিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করে না। নিজেই অর্থ করিয়া যাইতেছে, অঙ্ক কষিয়া যাইতেছে, বালক শিখিল কিনা সেদিকে মন নাই। প্রায় সকল গৃহ শিক্ষক এইরূপ। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে শিক্ষকের বেতন দেওয়া বৃথা ও অশুভকর। গঙ্গাপ্রসাদবাবুর সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। দুঃখের বিষয় এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠাপরায়ণ লোক আমি আর দেখি নাই, নিজেও কখন হইতে পারি নাই।

সংস্কৃত কলেজে আমার একজন সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার নাম স্মরণ নাই, কিন্তু তিনি এক অদ্ভুত লোক, তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ১৮।১৯ বৎসর হইবে। অত্যন্ত গরীব আর তাঁহার বস্ত্রাদি এত মলিন যে দেখিলে ঘৃণার উদয় হয়। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, স্বার্থ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, ভদ্রাভদ্র বিভিন্নতা তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি হৃদয়ে উদাসীন সন্ন্যাসী। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন। আর দেখা গেল না।

আমাদের বাসায় কিছুদিন একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক ছাত্র রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তাঁহার নাম জগবন্ধু রায়। তিনি মিশনারী স্কুলে পড়িতেন, রন্ধন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও স্কুলের খরচ চালাইতেন। লোকটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। কিছুদিনের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করিয়া ডাকঘরের কার্য্যে ব্রতী হয়েন। ইহার পরে ১৮৭০ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি ডাকঘরের কার্য্য-ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যখন চাকুরি ত্যাগ করেন তখন ২০০ টাকা মাত্র সংস্থান করিয়াছেন। ঐ টাকা লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্র Railway Station এ বিচালি ও জ্বালানি কাষ্ঠের দোকান করিলেন। ক্রমে চাউলের আমদানী করিলেন। ক্রমে একখানা ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করিলেন ও সেখানে তাঁহার পরিবার আনিলেন। কলিকাতার দক্ষিণে বাদায় জমি লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় গভর্ণমেণ্টের জেলখানা প্রভৃতিতে

রসদ যোগাইবার ভার লইলেন। ১৮৭৮ সালে আবার দেখা হইল তখন তিনি দোতালা গৃহ ও বাগান করিয়াছেন। আবাদে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে ৫০০০ বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার উন্নতি দেখিয়া আমার লোভ হইল। তখন আমি অনুরোধ করিলাম যে আমাকে অংশীদার করিয়া ভাগে কোন ব্যবসা করেন। তিনি স্বীকার হইলেন। আমার ৭০০ টাকা মাত্র তখন সঞ্চয় ছিল। ঐ টাকা তাঁহাকে দিলাম। বন্দোবস্ত হইল নদীয়া জেলার উত্তরে মুগ কলাই প্রভৃতি শস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতে হইবে। আমি সরকারী চাকুরি করি, কোন ব্যবসার কার্য্য আমি করিতে পারিব না, কেবল টাকা দিব মাত্র। শুনিলাম ঐ টাকা দিয়া একখানা নৌকা খরিদ হইয়াছিল। নিযুক্ত একজন লোক শস্য ক্রয় করিতে টাকা লইয়া গিয়াছে। প্রায় বৎসরাবধি পরে জানিলাম, সেই লোকটী লিখিয়াছে যে শস্য ক্রয় করিয়া এক ঘরে মজুত করিয়াছিল, দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়া সমস্ত ভস্ম হইয়া গিয়াছে। নৌকা বিক্রয় করিয়া ২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ঐ টাকা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিলাম যে তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা হউক। তাহা কিছু করিলেন না, বলিলেন আমার টাকা সময় মত ফেরত দিবেন। কিছুদিন পরে আবার তাঁহাকে ধরিলে ৫০০ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। মধ্যে মধ্যে ২০।২৫ টাকা করিয়া ১৮৮৮ সালে প্রায় ২৫০ টাকা দিয়া

দিলেন। তাহার পরে আর দেন নাই। হ্যাণ্ডনোটও তামাদি হইয়া গেল। ইতিমধ্যে তাঁহার নানাপ্রকার ব্যবসার উন্নতি হইয়া তাহার লক্ষ টাকার অধিক সম্পত্তি হইল। কিন্তু লোভ কি ভযানক জিনিষ!

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয়ো এবাভি বদ্ধতে॥

১৬০০০ টাকার জন্য এক জাল জীবনবীমা কবিয়া চারি বৎসর জেল ভোগ কবিলেন। তাবপব জেল হইতে আসিয়া আমাকে এক পত্র লিখেন যে তিনি আমার নিকট কিছু ধাবেন, তাহার জন্য আমি সমস্ত দাবী ত্যাগ করিলে আমাকে ১০০ এক শত টাকা তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি উত্তর দিলাম যে আমি বহুদিন আমাব দাবা ত্যাগ করিয়াছি। যে কার্য্য করা হইয়াছিল তাহাতে আমি লাভের জন্য যাইয়া লোকসান দিয়াছি। আমার নৈতিক দাবী কিছুই নাই। এখন তাঁহার সম্পত্তি তিন লক্ষ মুদ্রার অধিক, সাধাবণ উপকারার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান কবিয়াছেন।

রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদও আমাদের সহিত এক বাসায় থাকিতেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি অতি সদাশয় লোক। অতি অমায়িক, অকপট ও মিষ্টভাষী। প্রথম কলিকাতা আসিয়া আমার রেলগাড়ী চড়িবার সখ তিনি মিটাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাসস্থান জিরেট বলাগড় লইয়া যান। মগরা ষ্টেশনে নামিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইয়া নৌকায় জিরেট গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে এক বিছানায় শুইতাম। হঠাৎ তাঁহার গায়ে পা লাগিলে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পদধূলি লইতাম, কিন্তু তিনি এরূপ বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেন যে বোধ হইত আমি অপরাধ করিয়াছি। তিনি ইন্‌জিনিয়ার হইলেন। তাঁহার চালচলনে ব্যয়বাহুল্য ছিল। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীও আমার নিকট কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। তিনি পড়া বলিতে পারিতেন না, না পারিলেই প্রায় কাঁদিয়া ফেলিতেন। তিনি ও শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী বয়স্থা হইয়া যখন সন্তানাদি হইয়াছে তখনও এক পণ্ডিতের নিকট পড়িতেন। স্ত্রীদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে দুই ভ্রাতারই বিশেষ যত্ন ছিল। রাধিকাপ্রসাদ বহু দেশে কার্য্য করিয়া অবশেষে ২৪ পরগণায় District Engineer হইলেন। ভবানীপুরে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র। পুত্রদিগকে এত অধিক স্বাধীনতা দিতেন যে তাহারা পিতার ন্যায় বহুব্যয়ী হইয়া উঠিল। লেখাপড়ায় মন দিত না। বাল্যকালে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। একজন অতিরিক্ত সূপকার ছিল, তাহাদের ইচ্ছামত খাবার প্রস্তুত করিত। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম স্কুলের বালকের এত কি প্রয়োজন যে একজন ভৃত্য চাই। তাহাতে উত্তর করিলেন যে উহাদের জুতা সাফ করা ও বস্ত্রাদি ঠিক রাখা এই কাজ। উহাদেব স্বভাব ক্রমে বিগড়াইতেছে দেখিয়া গঙ্গাপ্রসাদ বাবু নিজ পুত্রদেব বক্ষাব জন্য ভ্রাতৃপুত্রদের নিজ গৃহে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কনিষ্ঠটি যখন ১৬ বৎসর বয়স্ক তখন গৃহ হইতে পলায়ন কবিল। আমি তখন বাঁকিপুরে। রাধিকা বাবু আমাকে লিখিলেন যে "আমার ২য় পুত্র বাঁকিপুব অথবা দানাপুরে লুক্কায়িত আছে। তাহাকে সন্ধান করিয়া দিতে হইবে।" তাঁহার একজন বন্ধুও আসিলেন। ঐ বন্ধু দানাপুর গেলেন, আমি পাটনায় গেলাম। সেই বন্ধু বালককে দানাপুরে এক কদর্য্য স্থানে সন্ধান পাইয়া ধরিয়া আনিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাধিকা বাবুর সহিত দেখা হইলে বলিলেন তাঁহার পুত্রেরা লেখাপড়া শিখিল না, অনেক চেষ্টায় কোন চাকরিও তাহাদেব জন্য জুটিল না, তাহারা ব্যবসা করিতে শিখিবে, সে জন্য প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা দিবেন। জ্যেষ্ঠ গিরীন্দ্র ১০,০০০ টাকা হাতে পাইযা পাটেব চালানি ব্যবসা আরম্ভ কবিল। প্রথমবার কিঞ্চিৎ লাভ হইল। গিবীন্দ্র বাড়া হইতে

বড়বাজার পর্য্যন্ত টেলিফোন বসাইলেন। গৃহ উত্তম রূপে সজ্জিত হইল, কতগুলি Waler ঘোড়া খরিদ হইল ও ২৫০০ টাকা মূল্যের একখানি গাড়ী প্রস্তুত আরম্ভ হইল। সেবার দুই ভাই একত্র এক জাহাজ ভাড়া করিয়া ডাণ্ডি নগরে পাট চালান করিলেন। ২০,০০০ হাজার বেল পাট চালান গেল। প্রত্যেক বেলের মূল্য ১১ টাকা। ডাণ্ডি পৌঁছিয়া Captain তারে সংবাদ দিল পাটের মূল্য কমিয়া দশ টাকা হইয়াছে। হুকুম হইল অপেক্ষা কর। অপেক্ষা করিতে করিতে মূল্য ৬ টাকায় নামিয়া গেল। এই লোকসানে রাধিকা বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তখন চাক্‌রি ত্যাগ করিয়াছিলেন। পেন্‌সন্ মাত্র ছিল। গৃহাদি সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। পুত্রদিগকে বাল্যকালে অধিক আদর দিয়া স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে এই ফল অনিবার্য্য।

পাঠ্যাবস্থা

১৮৬৪ সালে হাইকোর্ট বন্ধ হইলে দাদা আমাদিগকে লইয়া সাতক্ষীরার পথে নৌকায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ভয়ঙ্কর ঝড় (cyclone) যাহাতে ডায়মণ্ডহারবার Subdivision জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়া যায়। আমরা ৭ ভাই, এক মামা, ভগ্নীপতি, ও আর একজন আত্মীয় সকলে এক পান্‌সী নৌকায় তখন কুঁচেমোড়া বিলের মধ্যে। প্রত্যূষে বাতাস ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নৌকা চলিতেছে, বেলা ৯টার সময় বাতাসের বেগ অত্যন্ত অধিক হইল। নৌকা বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করাতে

ঝড়ের বেগে নৌকাকে ঠেলিয়া পরপারে লইয়া গেল। লোকালয় নাই, বৃক্ষাদি নাই, কেবল নল বন। নদী বা খাল অধিক পরিসর নহে। নল বন অবনত হইয়া জলের উপর পড়িয়াছে। সেই বনের উপর নৌকা আছড়াইয়া পড়িল। বন নৌকাকে ঠেলিয়া রাখিল। মাটীর পাড় হইলে নৌকা ভাঙ্গিয়া যাইত। সেই অবস্থায় সমস্ত দিন ও রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত ঝড়ের সঙ্গে একটী shrill বংশীরব শোনা যাইতে লাগিল। ঝড় নৌকার পিছন দিক হইতে আসিতেছে কাজেই ছপ্পরে তত বেগ লাগিতেছে না। তথাপি সকলেই জলে সিক্ত হইলাম। স্বল্প স্থান, কোন প্রকারে বসা যায়, ঠাসাঠাসি করিয়া শয়নও সম্ভব। সমস্ত দিন অনাহার ও শীতে কম্পমান্ নৌকাডুবির আশঙ্কা। অল্প চারিটা চিঁড়া ছিল, ও কিঞ্চিৎ চিনি, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। সন্ধ্যার সময় দাদা বালকদিগকে বলিলেন সব শুইয়া পড়, আমরা ৬টী বালক অর্দ্ধসিক্ত কাপড়ে ক্লান্ত অবস্থায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে ঝড় কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, মাঝিদের ভাঙ্গা চুলা কোন ক্রমে বাঁধিয়া, ভিজা কাষ্ঠ জ্বালিয়া, দাদা ও ভগ্নীপতি বহু কষ্টে এক হাঁড়ি ভাত রাঁধিয়াছেন। আমাদিগকে যখন ডাকিলেন তখনও ঝড় চলিতেছে। সেই গরম ভাত আর লবণ সমস্ত দিন পরে অতি উপাদেয় খাদ্য হইল। প্রত্যুষে ঝড় থামিয়া গেল, পরিষ্কার আকাশে সূর্য্যোদয় হইল। আমরাও লোকালয়ে পৌঁছিয়া দেখি অনেক বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও অনেক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে। পরে গৃহে পৌঁছিয়া ২।৪ দিন

পরে সংবাদ পাইলাম কলিকাতায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে। দুইখানি জাহাজ রাস্তার উপর উঠিয়াছে আর সহস্র সহস্র নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। Diamond Harbourএ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিযাছে।

পূজার বন্ধের পর ভবানীপুর আসিয়া London Missionary Society Schoolএ প্রবেশ করিলাম।

১৮৬৫ ফেব্রুয়ারী মাসে দাদা কৃষ্ণনগরে ২০০ টাকা বেতনে Collegeএর Paid Law Lecturer নিযুক্ত হইলেন। আমরাও কৃষ্ণনগর আসিলাম। তখন বগুলা পর্য্যন্ত ট্রেনে আসিয়া হাঁসখালি পার হইয়া গোয়াড়ি আসিতে হইত। ঘোড়ারগাড়ী অতি কদর্য্য ২।৩ খানি ছিল, তাহাও প্রায় পাওয়া যাইত না। গো-শকটে আসিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক এখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। সমস্ত দিনে ৫।৭ জনের অধিক হইবে না। এখন বোধ হয় ৫।৭ শত লোক যাতায়াত করে। তখন গোয়াড়িতে প্রায় সমস্ত খড়ের ঘর ছিল, দুই একটী পাকাবাড়ী দেখা যাইত। প্রতি বৎসর শুষ্ককালে আগুন লাগিয়া বহু গৃহদাহ হইত। রাস্তা সকলও কদর্য্য ছিল। তবে গোয়াড়ির প্রধান সুখের জিনিষ খড়িয়া নদী—অবগাহন স্নান আর উত্তম পানীয় জল।

সে বৎসর পূজার সময় বহরমপুর গিয়াছিলাম। খুড়ামহাশয় সেখানে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা হইতে নলহাটী

হইয়া আজিমগঞ্জে নৌকা করিয়া যাইতে হইয়াছিল। আসিবার সময় নৌকায় আসিলাম।

১৮৬৬ সালে জানুয়ারী মাস হইতে প্রথম পড়ায় মনোযোগ দিলাম। বেলা ৯টা বাজিলে পুস্তক ফেলিয়া উঠিতাম, হাতে একটু তেল লইয়া নদীতে ছুটিতাম, নদী বাসা হইতে অর্দ্ধ মাইল। স্নান ও আহার করিয়া ঠিক ১০টার সময় কলেজে হাজির হইতাম। তখন বালকদিগের কোন প্রকার খেলা বা ব্যায়ামের বন্দোবস্ত ছিল না। একত্র হইয়া সভাসমিতি করিবার রীতিও ছিল না। ২॥০টার সময় স্কুল বন্ধ হইলে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া আবার পাঠ। সন্ধ্যার সময় একটু ভ্রমণ, তাহাও কদাচিৎ। ১৮৬৬ ডিসেম্বরে Entrance পরীক্ষা, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয় নাই বলিয়া সে বৎসর পরীক্ষা দিলাম না। পর বৎসর ১৮৬৭ ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এখানকার স্কুলসমূহের মধ্যে আমি প্রথম হইলাম ও ১৪ টাকা বৃত্তি পাইলাম।

Presidency Collegeএ পড়িবার সাধ হইয়াছিল, এজন্য সেখানে First yearএ দিনকতক ছিলাম, কিন্তু mess সকল কদর্য্য, এজন্য গ্রীষ্মের বন্ধের পর আবার কৃষ্ণনগর আসিলাম। ১৮৬৯ ডিসেম্বরে First Arts পরীক্ষা দিলাম। সেবার যদিও First Grade-এ উত্তীর্ণ হইলাম ও ২৫ টাকা বৃত্তি পাইলাম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবের নাম আমার উপরে হইয়াছিল।

সে সময় স্কুল কলেজ ছুটী হইলেই বাড়ী বিদ্যানন্দকাটী

যাইতাম। সেবার বাড়ী যাইয়া দেখি আমার বিবা উপস্থিত।

আমার তখন ২২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কতদিন আরও ছাত্রাবস্থায় কাটাইতে হইবে, সংসার প্রতিপালনের অবস্থা কখনও হয় কিনা কিছুই স্থির নাই। তখন বিবাহ করা সম্পূর্ণ অনুচিত সে জ্ঞান সম্পূর্ণ ই ছিল। তথাপি অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিতে হইল। মহাসমারোহে ২১ খানা পাল্কী ও তদনুরূপ বাদ্যভাণ্ড ও বাজি লইয়া ১৪ ক্রোশ দূরে খাজুরায় যাইয়া বিবাহ হইল। বিবাহে আমার মনে কিছুমাত্র আমোদ বোধ হয় নাই। সে সময় কেবল ভাবিতাম এ দুর্ব্বহ ভার কিরূপে বহন করিব।

স্ত্রীকে সমুচিত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একটা কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে হইয়া উঠিল। যদিচ আমি অন্যত্র থাকিতাম তথাপি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্বশুর মহাশয়কে সর্ব্বদা বিরক্ত করিতাম ও যখন স্ত্রী আমাদের গৃহে কৃষ্ণনগরে থাকিতেন তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে এজন্য অনুরোধ করিতাম।

৬ বৎসর মধ্যে একত্র বাস অতি অল্পই হইত। ১৮৭৬ সাল অবধি যখন আমি সম্পূর্ণ গৃহী হইলাম তখন তাঁহার শিক্ষা নিজ হস্তে লইলাম। যখন আমাদের তিনটী সন্তান হইয়াছে তখনও তাঁহাকে ইংরাজি পড়াইতাম। ৪র্থ সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিলাম। সে ১৮৮৫ সালে।

F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দুই ভাই Presidency



বসন্তকুমারী বসু

Collegeএ গেলাম ও লালবাজার হিন্দু হোষ্টেলে অবস্থিতি করিলাম। সে সময় লোকের সহিত বাক্যালাপ করার অভ্যাস আমাব অতি কম ছিল। হোষ্টেলে কিছুদিন থাকিতে দেখিলাম যে আমার প্রকোষ্ঠে আর একজন বাস করিতেছেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে জানিতাম। পূর্ব্বে যখন সংস্কৃত কলেজে পডিতাম তখন তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে পড়া বলিয়া লইতাম। তিনি B A, পবীক্ষায় অকৃতী হইয়া Hindu Hostel-এ থাকিযা পড়িবেন এজন্য আসিয়াছেন। তাঁহার নাম বিদ্যাভূষণ। হোষ্টেলে এক ক্লাব স্থাপিত হইল, তিনি তাহার সম্পাদক হইলেন। প্রতি রবিবারে বক্তৃতা পাঠ হইত। এক রবিবারে আমি এক বক্তৃতা পাঠ করি, তাহাতে বিদ্যাভূষণ আনন্দিত হইয়া আমাকে কোলে করিলেন। সেই অবধি পূবব পরিচয় আবার নূতন হইল।

বিদ্যাভূষণ

সেই সময়ে তিনি নিজের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত আমাকে বলিতেন। তিনি ইতিমধ্যে তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম বিবাহ মাতা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৬ ও পাত্রীর ১৪। ৪ বৎসর পরে ঐ পত্নীর কাল হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় বিধবা বিবাহ করেন। সহধর্ম্মিণী সমবয়স্কা ছিলেন। ২।৩ বৎসর পরে ঐ পত্নীরও কাল হইলে মাতার অত্যন্ত অনুরোধে

আবার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সদ্য বিবাহ করিয়াছেন, ও কন্যাকে নিজে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে বিবাহ করিয়াছেন। এ সব কথা কিছুই বিস্ময়কর নহে। কিন্তু বিস্ময়কর তাঁহার অসাধারণ প্রেম, ও প্রত্যেক বধূর প্রতি সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, পরস্পর অসীম আকর্ষণ ও অসীম আগ্রহ। তাঁহার সেই প্রেমের বর্ণনার সময় এক এক বার তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে আবার তৎপরেই চির বিরহের দুঃখে ম্লান ও বাষ্পবারি পতন দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইতাম। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতিও তাঁহার প্রেম ও হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। ভাবিলাম বহিতে পড়িয়াছি প্রেম একবারই হয়। মহাদেব দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, এবং উভয় পত্নীই প্রেমে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে একই দেবী দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বিদ্যাভূষণের তিন পত্নীর কোনটীর সেরূপ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তত সময় ত' কেহ পান নাই। কাজেই বিদ্যাভূষণ একজন অদ্ভুত লোক। তাঁহার হৃদয় সহজেই বিগলিত হয়। তিনি কোন দুঃখের বা দুষ্কার্য্যের বর্ণনা শুনিলে এতদূর বিচলিত হইতেন যে তাঁহার সুস্থির হইতে অনেক সময় লাগিত। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ হইতে পারে কিন্তু তাহা লিখিবার উপায় নাই। আমার সঙ্গে তাঁহার বহুকাল আত্মীয়তা ছিল।



অক্ষমতা

আমাদের ক্লাবে বক্তৃতা হইত, এবং বক্তৃতার পরে তর্ক বা বিতণ্ডা হইত। যে বিষয়ে কেহ বক্তৃতা করিলেন সেই বিষয়ে যাহার যেরূপ অভিপ্রায় মন্তব্য বলিতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে বলিতাম, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম আমার বাক্য কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইত না। আমি অনেক নূতন কথার অবতারণা করিতাম, কিন্তু তাহা বিশদরূপে অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিতাম না। আমার সহপাঠী সজনীকান্ত চাটুয্যে আমার পরে উঠিয়া সেই সকল কথা এমন বিশদ করিয়া বলিতেন যে সেগুলি সকলেই প্রশংসার সহিত গ্রহণ করিতেন। আমি ভাবিতাম কি আশ্চর্য্য। আমার উদ্ভাবিত অভিমত লইয়া সজনী বাহাদুরী করিল ও আমাকে কেহ গ্রাহ্য করিল না। এই যৎসামান্য বিষয় দ্বারা বুঝা যায় যে প্রকৃতির ও মনের ভাণ্ডারে অসীম সংখ্যক রত্ন আছে বটে, সকলে তাহা দেখিতে পায় না, আবিষ্কার ত দূরের কথা। যে ব্যক্তি কোন রত্ন অস্পষ্ট দেখিয়া বা বুঝিয়া চলিয়া যায় তাহাকে আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি স্পষ্ট দেখিয়া সম্পূর্ণ গুছাইয়া প্রকাশ করিতে পারে সেই প্রকৃত আবিষ্কারক। প্রকৃতির ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি ডারউইনের পূর্ব্বে অনেক মহাত্মার মনে উদয়

হইয়াছিল, কিন্তু আর কেহ ঐ তত্ত্বের ফলাফল বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে ও তাহার কার্য্যকারণ আবিষ্কার করিতে যত্ন করেন নাই। কোন নূতন অভিমত অস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করা বৃথা। যে ক্লেশস্বীকার পূর্ব্বক যত্ন করিয়া লোককে বুঝাইতে পারে সে অবশ্য প্রশংসাযোগ্য। এই অক্ষমতা আমার চিরসহচর। কোন বিষয় কাহাকেও বুঝাই-বার কৌশল আমার অত্যল্প। আর এক অক্ষমতার জন্য সেই কালে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম।

একদিন রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হোষ্টেলে আসিয়া বলিলেন সেজদা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাত রোগে শয্যাগত আছেন। তাঁহার শুশ্রূষা করিবার প্রয়োজন, তিনি নিজে সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকেন, সে জন্য আমাদের দুই ভাইকে ভবানীপুর তাঁহাদের গৃহে যাইতে বলিলেন। আমরা দুই ভাই সেখানে যাইয়া দুই দিন থাকিলাম, কিন্তু রোগীর সেবার কোন কার্য্য করিতে পারিলাম না। গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর পত্নী ও ভ্রাতা সমস্ত করিতেন, কিছু করিতে বলিলে আমরা অবশ্য করিতাম, সে প্রায় কিছুই নহে। বিরক্ত হইয়া নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। রোগীর শুশ্রূষা এক বিদ্যা, শিক্ষা বা অভ্যাস সাপেক্ষ, কেবল ইচ্ছা থাকিলেই করা যায় না।

১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাসে B. A. পরীক্ষা হইল। আমরা দুই ভাই উত্তীর্ণ হইলাম। আমি First Grade-এ হইলাম ও ২০ টাকা বৃত্তি পাইলাম।

এই সময় হইতে ১০ বৎসর জীবন সুখকর হয় নাই। অনেক প্রকার মনঃকষ্ট ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নানা প্রকার নিষ্ফল ও স্বল্প ফলদায়ক চেষ্টায় মনের শান্তির একেবারে অভাব হইয়াছিল।

Mathematics-এ M. A. দিবার জন্য Presidency College-এ থাকিলাম। ইহার অগ্রে ২ বৎসর Law ক্লাসেও হাজিরা দিয়াছিলাম। ১৮৭২ সালেও আর এক বৎসর হাজিরা দিলাম। কলেজে ২২ টাকা মাসিক বেতন দিতাম, কিন্তু পড়া এক-প্রকার বন্ধ। Mathematics আমার পক্ষে গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু আমি কলেজে যাইয়া দেখি আমার অভিমত না লইয়াই আমার নাম ঐ ক্লাসে কে দিয়াছে, বোধহয় B. A. পরীক্ষায় আমি Mathematics-এ অধিক মার্ক পাইয়াছিলাম এই জন্য আমার ভাগ্যদেবতা এই খেলা খেলিয়াছেন। আমি প্রায় কিছুই শিখি নাই। ১৮৭৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পরীক্ষা দিলাম। কেন যে দিলাম তাহা এখন নিজেই বুঝি না। পরীক্ষা দিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া দেখি ভ্রাতা কেশব সাংঘাতিক পীড়িত। তিনমাস তাহার শুশ্রূষায় অতিবাহিত করিয়া তাহাকে লইয়া কলিকাতায় গেলাম ও গঙ্গাপ্রসাদবাবুর গৃহে রাখিলাম। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সি নৌকায় রোগী, আমি ও আমার দুই খুড়তুত ও জেঠতুত ভ্রাতা ও এক মামা কৃষ্ণনগর হইতে বৈশাখ মাসের শেষে যাত্রা করিলাম। প্রত্যহ বিকালে ঝড় হয়। আমরা বেলা থাকিতে নৌকা বাঁধি—কোলে অর্থাৎ স্বল্প-গভীর চড়ার উপর।

একদিন সুকসাগরের চড়ায় ঐরূপ নৌকা বাঁধিলাম, সেদিন সন্ধ্যার পর ঝড় অত্যন্ত প্রবল হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভ্রাতারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। মাতুলও ততোধিক। রোগী বলিল চল তটে যাই। এক ভ্রাতা বলিল মাঠে পটলের ক্ষেতে কুঁড়ে আছে, চল তাহার মধ্যে যাই। আমি বলিলাম যে ঐ বৃষ্টিতে রোগী কখনই বাহিরে যাইবার উপযুক্ত নহে। সকলেই জেদ করিতে লাগিল, রোগীভ্রাতা বলিলেন "তোমাদের কি ? নৌকা ডুবিলে সাঁতরাইয়া তীরে যাইবে, আমি কেবল মরিব।" শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইল। মনে মনে বলিলাম তোমাকে ফেলিয়া দিয়া যদি বাঁচিতে হয় সে জীবন নরকতুল্য--সে কখনই হইতে পারে না। প্রকাশ্যে বলিলাম যা হবার তা হউক, আমি জ্বরো রোগীকে কখনই বৃষ্টিতে যাইতে দিব না। ঘণ্টাখানেক পরে ঝড় থামিয়া গেল।

কেশব রুগ্ন হইয়া ৪ বৎসরের অধিক জীবিত ছিল, কিছুদিন পশ্চিম ভ্রমণ করিল ও অল্পদিন উকিল হইয়া High Courtএ যাতায়াত করিয়াছিল। ১৮৭৭ এপ্রিল মাসে তাহার কাল হয়।

দলাদলি

১৮৭৩ সালের জুন মাসে পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যানন্দকাটী গেলাম। তখন খুড়ামহাশয় যশোহরে Dy. Magistrate। তিনি মাতার কাল হইলে হিন্দুর নিয়মিত অশৌচ

পালন করেন নাই। গ্রামের অনেক লোক তাহা দেখিয়াছে। জ্যেঠামহাশয় শ্রাদ্ধ করিলেন, তিনি নিয়মানুসারে পরিধান, হবিষ্যান্ন আহার প্রভৃতি নিয়ম একমাস পালন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের খরচ খুড়ামহাশয় দিলেন। শ্রাদ্ধের দিবস সকালে খুড়ামহাশয়ের সহিত আমরা গৃহে পৌঁছিলাম। শুনিলাম গ্রামে ঘোঁট চলিতেছে, শ্রাদ্ধে কেহ আসিবে না ও আমাদের গৃহে কেহ আহার করিবে না। শ্রাদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণাদির সাহায্যে সম্পন্ন হইল। পরদিন বৃষোৎসর্গ ও কায়স্থদিগের ফলার। বেলা দুই প্রহরের সময় আত্মীয়গণ একত্র হইয়া আমাদের গৃহে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক কাঁধে করিয়া বৃষ লইয়া নদীতীরে যাইবার কথা। কিন্তু গ্রামের লোক কেহই আসিল না। শুনিলাম নিকটস্থ সমস্ত গ্রামে পত্র লিখিয়া অপর গ্রামবাসীদিগকে আসিতে মানা করিয়াছে। বেলা দুপুর সময়ে প্রতিবেশীদিগকে আহ্বান করিতে আমি নিযুক্ত হইলাম। নিকটস্থ এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে যাইয়া দেখি কতকগুলি কায়স্থ একত্র হইয়া এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছে। আমি বলিলাম জ্যেঠা-মহাশয়ের নিবেদন—আপনারা আসিয়া যোগদান করুন। তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন আর কে কে আসিয়াছে যাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমার উত্তর—জ্যেঠামহাশয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে বলেন নাই। অন্যান্য গৃহে যাইয়া কোন পুরুষ দেখিতে পাইলাম না। এক ব্রাহ্মণ গৃহে যখন পৌঁছিলাম তখন তিনি ঘরের ভিতর হইতে ঘণ্টার শব্দ

করিলেন। তিনি পূজায় বসিয়াছেন, উত্তর দিবেন না। কেহই আসিল না। আমরা গৃহের লোক মাত্র যাইয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। বিকালে দুইমণ ময়দার লুচি প্রস্তুত হইল, কিন্তু কায়স্থগণ কেহ আসিবে তাহার সূচনা দেখা গেল না। আমার এক পূজারী খুড়া বলিলেন কেহ না আসে, চাষা মুসলমানদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ভোজ দিবেন। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় বাহির হইয়া সকলকে বলিলেন শ্রাদ্ধ তিনি করিতেছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধে কোন অধিকার নাই, তিনি কোন কার্য্যই করিতেছেন না, তাঁহার দোষে শ্রাদ্ধকার্য্যে ক্ষতি হইবার কোন কারণ নাই, তখন সকলেই আসিলেন। তারপব দিন ব্রাহ্মণভোজন ও তারপব দিন কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির অন্নভোজন সমস্তই নিষ্পন্ন হইল।

M. A. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কি করা যায় এই সমস্যা। দাদামহাশয় বলিলেন B. L. উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইতে পারি, কিন্তু উহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। সে সময় Sir George Campbell Lieut. Governor এক নিয়ম করিয়াছিলেন Survey, Law ও English পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে Deputy Magistrate, Subdeputy Magistrate ও কাননগোর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহা না পারিলে কেহ Deputy বা Subdeputy হইতে পারিবে না। আমি পূর্ব্বে কখন কখন ঘোড়ায় চড়িয়াছি, কিন্তু আমার আসন কখনই স্থির হয় না, ঘোড়া দৌড়াইলেই পড়িয়া যাই। চুঁচুড়ায় গভর্ণমেণ্ট এক Civil Service ক্লাস

খুলিয়াছেন, তাহাতে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়া হয় ও Survey, Law, Chemistry, Botany শিক্ষাও হয়। আর সমস্ত বিষয় অন্যত্র শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু অশ্বারোহণ শিখিবার উপায় আর কোথায়ও নাই।

অগত্যা জুলাই মাসে চুঁচুড়া যাইয়া সেই Civil Service ক্লাসে প্রবেশ করিলাম। Chemistry, Botany আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, ঐ সকল বিষয় শিখিতে আমার যথেষ্ট আগ্রহ হইয়াছিল। Gymnastics-ও যত্ন করিয়া শিখিতাম। অশ্বারোহণ প্রত্যহ করিতাম। কিন্তু কিছুতেই আমার আসন শক্ত হয় না। ক্রমাগত আছাড়।

নভেম্বর মাস হইতে প্রতি মাসে অশ্বারোহণের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পরীক্ষার দিন অনেক দর্শক সমবেত হয় ও অনেকগুলি ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়াইতে থাকে। অনেক গোলমাল ও চীৎকার, তাহার মধ্যে পরীক্ষা দিতে আমার সাহসে কুলায় না। আর আমি প্রায়ই পড়িয়া যাই। ঐ গোলমালের সময় ঘোড়াগুলি অধিক অস্থির হয়। তখন অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকিবার আমার ত কোনই সম্ভাবনা নাই। November, December, January, তিন পরীক্ষা হইয়া গেল, আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হয় না। প্রত্যহ দুইবেলা চড়িয়া বেড়াই। এক পতনে আমার দক্ষিণ হস্ত বাঁকিয়া গেল। দুই মাস বেদনা থাকিল, তথাপি ছাড়ি না। প্রত্যহ চড়িতে হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন আমি একা চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট

চক্রে ঘুরিতেছি, ইতিমধ্যে আমাদের পরীক্ষক Professor Rowe নিজ অশ্বে উঠিয়া আমার সঙ্গে চক্র দিতে লাগিলেন। একবার আমার পিছনে আসিয়া আমার ঘোড়াকে কষাঘাত করিলেন, ঘোড়া লাফাইয়া উঠিল, আমিও ভূমিশয্যা পাইলাম। তিনি চক্রে শেষ করিয়া আবার যখন আসিয়াছেন তখন আমিও আবার চড়িয়া তাঁহার সঙ্গী হইলাম। পরে তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহার নিজ ঘোড়ায় আমাকে চড়িতে বলিলেন। সে ঘোড়া আমি বেশ চালাইলাম, ও তিনি যেমন যেমন নানা দিকে ফিরাইতে বলিলেন তাহাও সমাধা করিলাম তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে উত্তীর্ণ করিলেন। এরূপ সুযোগ না হইলে আমি কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না। Rowe সাহেবের সহিত আমার পরিচয় ছিল না, কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করি নাই। কেন তিনি এই অনুগ্রহ করিলেন তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

পরে এপ্রিল মাসে আর সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে দেখা গেল আমি দ্বিতীয় হইয়াছি। কিন্তু যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি সেই সময় লোকান্তর প্রাপ্ত হন, আমিই প্রথম।

সেই সময় Sir George Campbell কার্য্য ত্যাগ করিলে Sir Richard Temple Lieut. Governor হইলেন। Campbell সাহেবের সঙ্গে Civil Service Class ও উঠিয়া গেল, যাহারা পাস হইয়াছিল তাহাদেরও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল।

আমরা জন ১০।১২ First Grade-এ উত্তীর্ণ হই। আমাদিগের নাম ভাগ করিয়া দুই দুই জন প্রত্যেক Commissioner-এর নিকট গেল, তাঁহারা আমাদিগ'কে নিযুক্ত করিবেন। অন্যান্য Division-এ প্রায় সকলেই শীঘ্র চাকবি পাইল। কেহ Deputy Magistrate কেহ বা Sub Deputy হইল। আমাদের কিছুই হয় না। ১৮৭৪ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর দুই মাস আলিপুরে Sub Deputy হইলাম।

১৮৭৫ সালে জানুয়ারী মাসে অল্প দিনের জন্য Court of Wards-এব অধীনে এক সামান্য Estate-এর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া ৪ মাস ধবিয়া বড়িষা গ্রামে ছিলাম। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী ব্রাহ্মণ বালক।

বহুবিবাহ

সাবর্ণ চৌধুরী ব্রাহ্মণের কুলপোষাক অর্থাৎ কুলীন ব্রাহ্মণ অন্যত্র কুল ভঙ্গ করিলে ইঁহাদের গৃহে আবার বিবাহ কবেন। সাবর্ণ চৌধুরীরা নিজেদের কৌলিন্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কন্যাগণকে বহু বিবাহিত পুরুষ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের কন্যা কখনই অবিবাহিত বরকে বিবাহ করিতে পারেন না। কাজেই কেহ স্বামীঘরে যান না। চিরদিন পিতৃগৃহে লালিত হন। কোন কোন জামাতার অনেক বিবাহ থাকে। আমি যে গৃহে ছিলাম সে গৃহের ৭।৮ জন জামাতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একজন

কৈলাসবাবু তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ৪০ বৎসর, তাঁহার আদিম বাস লক্ষ্মীপাশা গ্রামে। সে বাসস্থান বহুদিন ত্যাগ করিয়াছেন, কেবল বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে ঘুড়িয়া বেড়ান। তিনি আফিম সেবক। প্রায়ই নেশায় ঢুলিতেন। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কতগুলি .সংসার, তিনি উত্তর করিলেন "দাদা, ঠিক গুনিয়া বলিতে পারি না। বোধ হয় ৪ কুড়ির অধিক হইবে। কি করি দাদা, বাপ মা লেখাপড়া শেখায় নাই, এই আমার জীবিকা। এক এক শ্বশুরবাড়ী যাইয়া বৎসরে কিছুদিন থাকি। যাহাদের অবস্থা মন্দ তাহাদের বাড়ী প্রায়ই যাই না।"

কুলীন জামাতা আসিলে ধুতি চাদর ও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া থাকেন। এইজন্য যে কন্যার বা কন্যার পিতার সঙ্গতি আছে তাহার গৃহে জামাতারা মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করিয়া থাকেন। অন্য জামাতাদের অত অধিক বিবাহ হয় নাই। তিন, পাঁচ, সাত বিবাহ সকলেরই হইয়াছে।

সকলেই যে কেবল বিবাহ করিয়া দিনপাত করেন তাহা নহে। কেহ কেহ অন্যান্য কার্য্যও কখনও কখনও করেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এই কন্যাদের সন্তানগণের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয়।

সর্ব্বত্রই কুলীন কন্যাদিগের সন্তান যে অশিক্ষিত হয় তাহা নহে। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি, মাতামহ গৃহে পালিত হইয়া কেহ কেহ শিক্ষাবলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণভোজন

জমিদার গৃহে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ভোজ হইত। কিন্তু নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনা সামান্য। তাঁহারা সকলেই এক একটী ঘটি লইয়া আসিতেন। গৃহের ভৃত্য আঙ্গিনা সাফ করিয়া কতকগুলি পাতা দিয়া গেল। অভ্যাগতেরা নিজ নিজ আসন লইয়া বসিলেন। তাহার পর পরিবেশন হইল। লুচি, মৎস্য, ও সন্দেশ অনেকাংশ ঘটীর ভিতর প্রবেশ লাভ করিত। যে মাত্র তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মুচী, চামার জাতীয়া স্ত্রীলোকগণ আক্রমণ করিল। তাহারা অবশ্য উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণগণ উঠিবা-মাত্র ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সকলেরই হস্তস্থিত ঘটী স্পর্শ-দুষ্ট হইল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। এখানকার ভোজের একটী নির্দ্দিষ্ট উপকরণ চিনির মুড়কি। সর্ব্বশেষে এই দ্রব্য পরিবেশন হয়।

৪ মাস পরে এ চাকরি শেষ হইল। Presidency Commissioner আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি না বুঝিয়া তাঁহার নিকট বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলাম এই অপরাধ।

যাহা হউক আবার আগষ্ট মাসে তিন মাসের জন্য খুলনায় Sub Deputy হইলাম।

১৮৭২ সালে যখন Road Cess আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন জমির উপর কর ভিন্ন ব্যবসার উপরও শুল্ক ধার্য্য হয়। এই

শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য কতকগুলি যুবা পুরুষ নিযুক্ত হয়। তাহাদের কোন পাকা চাকরি ছিল না। কিন্তু তাহারা আশা করিয়াছিল যে অধিক শুল্ক ধার্য্য করিলে গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। এই জন্য তাহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। সেই শুল্ক অনেক অনাদায়ী ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা আমার কাজ হইল। তাঁতী, যুগী, জোলা, যাহাদের ব্যবসা ম্যান্‌চেষ্টারের কলের কাপড়ে একেবারে ধ্বংস করিয়াছে তাহাদের উপর এই শুল্ক বিশেষ অনিষ্টকর ছিল। ৫।১০।২৫ টাকা করিয়া বাকি। কিন্তু তাহাদের কাহারও গৃহে খড় নাই। কাহারও গৃহে একটি ধাতুপাত্র নাই। কেহ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মজুরি করিয়া জীবন যাপন করে, কেহ ভিক্ষা করে। ইহাদের নিকট টাকা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

খুলনায় ম্যালেরিয়া জ্বর বাধাইয়া অগ্রান মাসে কৃষ্ণনগর আসিলাম। মনস্থ করিলাম আর চাকরির জন্য চেষ্টা করিব না। B. L. পরীক্ষা দিয়া উকিল হইব। ১৮৭৬ জানুয়ারী মাসে B. L. পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার পরই সংবাদ পাইলাম সাতক্ষীরা ও বসিরহাটের সাবডেপুটি বহাল হইয়াছি।

একটী বিছানা মাত্র লইয়া নৌকাযোগে সাতক্ষীরায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া জানিলাম যে এক বিস্তীর্ণ বিল—দাঁতভাঙ্গার বিল—জরিপ করা ও জমিদারী জমি হইতে সরকারী জমি পৃথক করা আমার কার্য্য হইল। ছয় সপ্তাহ

মাত্র ঐ কার্য্য করিয়া একবার বিদায় হইলাম। আবার ১৫দিন পরে বহাল হইলাম।

ইতিমধ্যে আমি B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। ঐ সর্পসঙ্কুল বিলে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু উকিল হওয়া দাদার অমত, আর নিশ্চিত আয় ত্যাগ করা বিবাহিত লোকের পক্ষে অসম্ভব।

আবার সেই বিলে যাইয়া অধিষ্ঠান হইলাম। জমিদারের কাছারী বা চণ্ডাল কৃষকের বাহিবের ঘর বাসস্থান। আমিন, Canongo সাহায্যে চেন কম্পাস লইয়া জরিপ এই মাত্র কাজ।

নভেম্বর মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই কাজ। অন্য সময় সাতক্ষীরায় থাকিয়া দুই চারিটী ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমা, খাসমহাল বন্দোবস্ত, Municipality বা রোড সেসের কার্য্য। সে সকল অতি সামান্য। গুরুতর কার্য্য জরিপ, যাহাতে আমার নিতান্ত অরুচি। কখনও ঘোড়ায়, কখনও নৌকায়, কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাসমহাল বাদা অঞ্চলে ছিল। দাঁতভাঙ্গার সীমানা ঠিক করা তিন বৎসরের মধ্যে আলিপুরেব কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোনীত হইল না। তারপরে জমিদারগণ মোকদ্দমা করিয়া উহা জমিদারীভুক্ত করিয়া লইল। বসিরহাটের এলাকার মধ্যে আর একটী বৃহৎ বিল আমার জরিপ জমাবন্দীর মধ্যে আসিল। সাতক্ষীরা থাকিয়া সেখানেও কার্য্য করিতে হইত। ভ্রমণ ও তৎসহ শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট পাইতে হইত। বৈশাখ মাসের রৌদ্রে ঘোটকারোহণ অসম্ভব

বলিয়া রাত্রে দূরাদূর যাইতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে ঘোড়ায় যাইতাম। আষাঢ় মাসের পর নৌকা সর্ব্বত্র যাইত। ভ্রমণের খরচা ১৸৹ বা ৸৹ আনা ছিল। ইহার মধ্যে খরচ কষ্টে চলিত, মাহিনাও ১৫০ টাকার অধিক নহে।

সাতক্ষীরায় প্রথম একখানি গোয়ালঘরের ন্যায় কুটিরে ছিলাম। এক বৎসর পর নিজে ৪খানি ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করিয়া সেখানে পরিবার আনিলাম।

১৮৭৮ সালে নূতন License Tax জারী হইল। যে ব্যবসাদারের বাৎসরিক আয় একশত টাকা তাহারও এক টাকা শুল্ক দিতে হইত, শতকরা একটাকা দরিদ্রের জন্য, কিন্তু আবার যাহার লক্ষ টাকা আয় তাহার একশত টাকা মাত্র দিতে হইত। ইহাতে দরিদ্র দোকানদার, মৎস্যব্যবসায়ী, বস্ত্রবয়নকারী প্রভৃতির মহাবিপদ উপস্থিত হইল।

বৈশাখ মাসে বসিরহাটে আমি ঐ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। প্রায় দুইমাস নৌকায় বাস করিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সামান্য পান্‌সী নৌকা, রৌদ্রের সময় তাহাতে বাস করা ও রন্ধন করা যে কি বিপদ তাহা বর্ণনাতীত। সকালে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আসিয়া রন্ধন ও আহার, তারপর তীরে কোন বৃক্ষতলায় আশ্রয়, পরে আবার ভ্রমণ, সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি, নৌকায় বাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার হাড়োয়া থানায় গেলাম। সেখান হইতে ৫ ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে যাইতে হইবে। সেখানে

যাইবার জন্য পাল্কী ভিন্ন অন্য যান সম্ভব নহে। শুনিলাম বেহারাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু পুলিশের ভয়ে কেহ আসিবে না। জমিদারের কাছারী আছে, নায়েব মহাশয়কে বেহারা নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন বেহারা তাঁহার কথায় স্বীকার হইবে না। তিনি একজন পদাতিক দিতে পারেন, সে ব্যক্তি একজন কনেষ্টবলের সাহায্য পাইলে বেহারা সংগ্রহ করিতে পারিবে। Sub Inspector পদাতিকের সঙ্গে একজন কনেষ্টবল পাঠাইবেন বলিলেন। আমার কিঞ্চিৎ অসুখ হইয়াছিল, নৌকায় যাইয়া শয়ন করিলাম।

একঘণ্টা পরে একজন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল, ৪॥ হাত লম্বা যুবাপুরুষ, আসিয়া আমাকে ডাকিল, বলিল "মানুষ খুন হুয়া"। সে ব্যক্তি কাঁদে আর বলে যে হাম্ কুছ নেহি কিয়া ছেরেফ এক আদমিকা হাত পাকড়া আওর ও মর গিয়া। এই বলে আর এদিক ওদিক দেখে। আমার মনে হইল সে পালাইবার উপায় দেখিতেছে। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ এক কথাই বলে। আমি তাহাকে বলিলাম ভয় নাই, লাস কোথায় আছে বল। সে বলিল থানায় আছে। তখনই থানায় চলিলাম। যাইয়া দেখি থানার আঙ্গিনায় স্ত্রী পুরুষের ভিড় হইয়াছে। ৫০ জনের কম নহে। কেহ কাঁদিতেছে। এক পার্শ্বে একটা খাট্‌লিতে লাস পড়িয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কি জাত, হিন্দু না মুসলমান? তাহারা বলিল মুসলমান। আমি উচ্চৈঃস্বরে দারোগাকে বলিলাম মহাশয়

একখানি কোদালি দেন। উহারা ঐ বনের মধ্যে লাস পুঁতিয়া ফেলুক। ইহা বলিয়া আমি এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৫ মিনিট পরে বাহির হইয়া দেখি সব লোক চলিয়া গিয়াছে। লাস খাটুলির উপর ঈষৎ উঁচু হইয়া বসিয়া আছে, আর খাবি খাইতেছে, আর দুইজন স্ত্রীলোক তাহাকে বাতাস করিতেছে। বলিল মরে নাই, মরিবার মত হইয়াছে। তখন আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, ওর ঘাড় ফুটা না করিলে জ্ঞান হইবে না। দারোগা মহাশয়, একখানা ছুরি দেন, ওর ঘাড় ফুটা করিতে হইবে। এই বলিয়া আবার ঘরে ঢুকিলাম। একটু পরে বাহির হইয়া দেখি, লাসও নাই, খাটুলিও নাই, সকলেই তিরোহিত হইয়াছে।

এই ট্যাক্স ধার্য্যে যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, তাহাতে স্থির করিলাম, এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়া ওকালতি করিতে যাইব। এইরূপ স্থির করিয়া একদিন বসিরহাটে পৌঁছিলাম, নৌকা হইতে বাহির হইতেই একজন পেয়াদা একখানা সরকারী পত্র আমার হাতে দিল। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে ট্যাক্স ধার্য্য কার্য্য হইতে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। আমি পুনরায় সাতক্ষীরায় যাইতে পারি। এ সৌভাগ্য যে কিরূপে সংঘটন হইল তাহা জানি না। আমি কোন প্রার্থনাও করি নাই।

জরিপ জমাবন্দীর কার্য্যে মধ্যে মধ্যে হাঙ্গামা করিতে হইত। দুই একটী এখানে লেখা যাইতে পারে।

একবার এক কাননগো লিখিলেন যে তিনি যেখানে জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেখানে জমিদারের কর্ম্মচারীরা তাঁহার

কার্য্যে বাধা দিতেছে। আমি দুই তিন মাইল দূরে অন্য গ্রামে ছিলাম। রাত্রে সংবাদ পাইলাম। উত্তর লিখিলাম সকালে কাননগো বিলে জরিপ করিতে যাইবেন। আমি উপস্থিত থাকিব। প্রত্যুষে এক ক্ষুদ্র ঘোটকারোহণে অভ্যস্ত পিচের ছড়ি হস্তে কথিত স্থানে পৌঁছিলাম। কাননগো ২।৩ জন চেনম্যান সহ আসিলেন। দুইজন জমিদারের কর্ম্মচারী, একজন বলিলেন তিনি Superintendent. আর একজন গোমস্তা। আর প্রায় ২০ জন প্রজা ও পাইক উপস্থিত। Superintendent তাহার মনিবের পত্র পড়িয়া আমাকে শুনাইলেন। জমিদার একজন কৃতবিদ্য লোক। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার জমিতে যেন শিকল ফেলিতে দেওয়া না হয়। Superintendent বাবু আমাকে বলিলেন "মহাশয় এ কার্য্য করিবেন না। করিলে আমি নিবারণ করিতে বাধ্য হইব। নতুবা জমিদারের হুকুম অমান্য করিলে আমার চাকরি থাকিবে না।" আমি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া জরিপ করিতে আজ্ঞা দিলাম। গোমস্তা আসিয়া শিকল ধরিল। আমার আজ্ঞায় একজন তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া ছাড়াইয়া লইল। তখন Superintendent বাবু বলিলেন "মহাশয়, আমি আপনাকে নিরস্ত করিতে পারি, কিন্তু জেলে যাইতে হইলে জমিদার ত যাইবে না। আমাকেই যাইতে হইবে, সেই ভয়।" পরে শুনিলাম তাঁহারা বসিরহাটে Subdl. Magistrateএর নিকট আমার নামে ফৌজদারি নালিশ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সেই জমিদারের অন্য

এক গ্রামে আর এক গোমস্তা দ্বিতীয় কাননগোকে বাধা দেয়। সেখানে যাইতে পথে অত্যন্ত জ্বর হইল। অগত্যা একখানা পাল্কী করিয়া জমিদারের কাছারী গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি গোমস্তা একা বসিয়া আছে। তখন অত্যন্ত জ্বর, তাহাকে যাহা মনে আসিল গালাগালি ও শাসন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পল্লীগ্রামে বাস করিতে হয়। বাঁধিবার কাষ্ঠ সেখানে ক্রয় করিতে প্রায় পাওয়া যায় না। সরকারী চৌকিদারগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিত। এক Out Post এর হেড্ কনেষ্টবল চৌকিদারদিগকে আমার কোন কার্য্য করিতে মানা করিয়া দিল। ২।৩ দিন কাষ্ঠাভাবে কষ্ট হইল। একদিন গ্রামের হাট, আমার সঙ্গে দুইজন কাননগো ও ৪।৫ জন লোক ছিল। তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলাম হাটে চৌকিদার পাইলে ধরিয়া আনিবে। তিন জন চৌকিদারকে ধরিয়া আনিল। তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দেওয়া হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। তাহারা যাইয়া ফৌজদারী নালিশ করিল, গ্রামের একজন তথাকথিত ভদ্রলোক তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া দিলাম। কাষ্ঠ আহরণের কষ্ট কিছুই কমিল না। তাহাদের মোকদ্দমায়ও কোন ফল হইল না।

সাতক্ষীরায় দোলের সময় মেলা হইত। সে মেলার বীভৎস কাণ্ড লিখিবার যোগ্য নহে। তবে দেশীয় ভদ্র-লোকদের বিশ্বাস কত সহজ সে বিষয়ে একটী নিদর্শন দেওয়া

যাইতে পারে। একদিন বিকালে মেলা দেখিতে যাইতেছি, পথে ৪।৫ জন উকিলের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাবা সেখানকার প্রধান লোক। তাঁহারা বলিলেন "মহাশয়, কাটা মুণ্ড কথা বলিতেছে, আমবা দেখিয়া অ।সিলাম, অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড।" তাঁহাবা জানিতেন যে আমি সহজে কিছু বিশ্বাস করি না, এজন্য আমাকে বিশেষ কবিয়া বলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মেলায যাইয়া দেখি একটা পর্ণ কুটীরের মধ্যে একখানা ক্যাম্প টেবিল, তাহার মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র, ঐ ফুটা দিযা একজন মাথা উপবে উঠাইযা কথা বলিতেছে। তাহার শরীর একটা লাল পর্দ্দাব পশ্চাতে আছে। পর্ণকুটীবেব বেড়াও লাল পর্দ্দায় বেষ্টিত। কাজেই বোধ হইতেছে কেবল মাথাটা আছে, ধড় নাই।

১৮৮০ সালে তিন মাসের বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়া Dy Magistrate হইবার চেষ্টা দেখিলাম। Sir Ashley Eden তখন Lieut. Governor, তাঁহার পরিচিত জমিদাব বংশ হইতে Dy. Magistrate মনোনীত করিতেছেন। Subdy-দিগের কোন আশা নাই। Hindu Patriot-এব সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল গভর্ণরের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার কোন বন্ধু যে চাকৃরির প্রার্থী হয তাহাতে আর কেহ প্রাথী হইলে সে ক্ষুধার্ত্ত শকুনি বলিয়া Hindu Patriot-এ অভিহিত হইত। Chief Secretary Cockrell সাহেব আমাব কোন দাবী গ্রাহ্য কবিলেন না। তিনি বলিলেন Sir Ashley Eden's Government সবডিপুটিদিগকে কোন আশা কখনও দেন

নাই। পূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট আশা দিয়াছিলেন তাহাতে আমরা ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পাইতেছি, এখনকার উকিলগণ তত উপায়ও করিতে পারে না। Civilian বাহাদুরদের এক আশ্চর্য্য ধারণা যে উকিলগণের আয় অতি অল্প। সে সময় অন্যান্য বাহাদুরের নিকটও ঐ উক্তি শুনিয়াছি। যাহা হউক যে আশা করিয়া বিদায় লইয়াছিলাম তাহা নিষ্ফল হইল। সে সময় যে কেন চাকরি ত্যাগ করিলাম না তাহাই বিবেচ্য।

আমার ন্যায় গুণহীন ব্যক্তি, যাহার লোকের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা নাই, যাহার বাক্‌পটুতার একেবারে অভাব, হঠাৎ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ, যাহার যথেষ্ট অভিমান আছে, আর যাহার মনে বিনয় থাকিলেও তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার যোগ্যতা নাই, রাজপুরুষ বা মান্যগণ্য লোকের নিকট কিরূপে পেশ হইতে হয় তাহা শিক্ষা বা অভ্যাস নাই, অথবা যাহার বড়লোক সহায় নাই তাহার পক্ষে উমেদারী বা চাকরি করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার দাবীর মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলাম; আমার চাকরি পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, সবডিপুটি চাকরি ও তাহার পর যে কিছু উন্নতি করিয়াছিলাম, তাহাও কাহারও অনুগ্রহে হয় নাই। ভাগ্যবলে বা বিধাতার অনুগ্রহে হইয়াছিল।

বিদেশীয় রাজপুরুষগণ আমাকে কেন অনুগ্রহ করিবেন, তাহার কোনই কারণ নাই। তাঁহারা অগ্রে দেখেন যে প্রার্থী রাজভক্ত কি না, তারপর কার্য্যক্ষমতা বিষয়ে বিবেচনা। রাজভক্তি

প্রকাশ করিতে বিনয়ী বা চাটুকার হওয়া প্রয়োজন। মনে যতদূর ভক্তি থাকুক বা না থাকুক, বাক্যাড়ম্বর দ্বারা বা ব্যবহার দ্বারা অতিভক্তি প্রকাশ করা চাই। তাঁহারা যতই কেন সূক্ষ্মদর্শী হউন না, এ দেশীয় লোকের মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ পাঠ করিতে প্রায়ই অক্ষম। ভক্তি প্রদর্শন ভিন্ন তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ পাইবার আশা নাই। এদিকে কোন প্রকার প্রদর্শন আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমার এক বন্ধু, বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতায় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি উচ্চবংশীয় ও অনেক প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু একখানি প্রশংসাপত্রে লেখা ছিল যে তিনি স্বাধীনচেতা, তাঁহার সমস্ত গুণ এই স্বাধীন-চেতা বাক্যে ভস্ম হইয়া গেল, তিনি কখনই চাকরি পাইলেন না। সরকারি চাকরির এই অবস্থা, শুভ কি অশুভ বিচার করা কঠিন। সৎস্বভাব, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ লোক পরিত্যক্ত হয়, আবার কপট, ক্ষুদ্রাশয় লোকও নির্ব্বাচিত হয়। প্রকৃত গুণ নির্ব্বাচন করা বিদেশীয় রাজপুরুষগণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবে যে সময়ে সময়ে উপযুক্ত লোক মনোনীত হয় না ইহা বলি না। অনেক উপযুক্ত, উৎকৃষ্ট, কর্ম্মক্ষম লোকও সরকারি চাকরিতে আছেন, আবার নিকৃষ্ট অনুপযুক্ত, লোকও আছেন। বাকলাণ্ড নামে সেকালে একজন কমিশনার ছিলেন। সে সময় কমিশনারগণই Dy. Magistrate নির্ব্বাচিত করিতেন। যে ব্যক্তি তাহার নিকট ময়লা, ঢীলে চাপ্‌কান ও বৃহৎ সামলা পরিধান করিয়া না যাইতেন, তাঁহাকে তিনি

অবিলম্বে দূরীভূত করিতেন। তারপরে যে ছুই হাতে মাথা হেঁট করিয়া সেলাম করিত ও আধা ইংরাজি, আধা বাঙ্গালা কথা বলিত সেই তাঁহার প্রিয় হইত। তিনি চাপরাশীর পুত্র, ধোপার পুত্র এই সকল লোককে উচ্চপদ দিতেন।

উকিল হইলেও যে কখনও আমার অবস্থা উন্নত করিতে পারিব সে আশা আমার ছিল না। আদালতে প্রকাশ্য বিনয় প্রদর্শন, সকল উকিলদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ও নিজের অভিপ্রায় গোপন, মক্কেলদের সহিত মৌখিক আত্মীয়তা এ সমস্তই আমার প্রকৃতির প্রতিকূল। বিশেষ অনর্থক বক্তৃতা—অর্থাৎ যে বক্তৃতায় কোন সার নাই—বুঝিয়াও সেরূপ বাক্য অনর্গল বলা আমার ক্ষমতায় কুলায় না। তাহা না পারিলে মফঃস্বলের কোন উকিল পসার করিতেও পারে না। অতএব চাকুরি আমার একমাত্র অবলম্বন।

সাতক্ষীরায় প্রথম দেড় বৎসর ১০০৲ টাকা মাহিনা ছিল। পরে ১৫০৲ টাকা হয়। ইহাতে সংসার চালাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহা হইতে আত্মীয়দিগকে আবশ্যক মত দান। তাহাতেও কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। খাই খরচ ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকার বেশী লাগিত না। চাউলের মূল্য মণকরা ১৸৴৹ বা কিঞ্চিৎ অধিক। বস্ত্রাদি আমার অল্প মূল্যের ছিল।

সাতক্ষীরায় বাঙ্গালী Dy. Magistrateগণের অধীনে কার্য্য করিতে হইত। তাঁহাদের সাহায্যে উন্নতি হওয়া অসম্ভব কারণ তাঁহারা নিজেদের সামলাইতেই ব্যস্ত। অপকার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল, ও কেহ কেহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

মধ্যে একজন অতি মহৎ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। তাঁহার নাম উমাচরণ গাঙ্গুলি। তিনি অতি সদাশয় মধুব প্রকৃতি ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী। তাঁহার সন্তান ছিল না। সাতক্ষীরায় তখন তিন জন মুনসেফ্। একজন ম্যানেজার, ডাক্তার প্রভৃতি ৬।৭ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার ন্যায় সম্ভ্রম ও সমাদর করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। সন্ধ্যার সময় তাঁহার গৃহে সকলে একত্র হইয়া খেলা, গান, কখনও ভোজন হইত। তাঁহার নিকট আমি অনেকরূপে উপকৃত। এরূপ সদাশয় লোক কদাচিৎ আমার পরিচিতের মধ্যে পাইয়াছি।

সাতক্ষীরার জমিদার

এই জমিদারী অতি বিস্তীর্ণ ছিল, বংশধরও অনেক। সকলের কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যখন সাতক্ষীরায় যাই তখন দেবনাথ চৌধুরী ও উমানাথ চৌধুরী সেখানে জীবিত ছিলেন। দুইজনেই ঋণগ্রস্ত। দেবনাথের নৈতিক স্বভাব ভাল ছিল। উমানাথ তাহার বিপরীত। তাঁহার গুণেব মধ্যে তিনি একজন সুগায়ক। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন খাস মহালের খাজনা বাকিতে ঋণী হয়েন। সেই ঋণ আদায় করিতে Certificate decree জারি হয়। কিন্তু টাকা আদায় হয় না।

একদিন আমি ক্রোকী ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া তাঁহার গৃহে গেলাম। আমি গেটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে গেট বন্ধ হইয়া গেল। আমি বাহিরে বসিলাম। একটী রূপার ডিবায় পান ও রূপাবাঁধান হুকা আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হইল। ধূমপান করিয়া চলিয়া আসিলাম। অল্প দিন পরে কমিশনার Monro সাহেব হুকুম দিলেন পুলিশ সাহায্যে ও যেরূপে পার তাঁহাকে গ্রেপ্তার কর। একদিন শেষ রাত্রে Subdl. ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি, পুলিশ Inspector, Sub-Inspector ১০।১২ জন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিলাম। অগত্যা সকালে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতা দেবনাথের পুত্র মহেন্দ্রবাবু আসিয়া জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিলেন।

দেবনাথ কোন কুকার্য্যাসক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অনেক প্রকার খেয়াল ছিল। তিনি সাতক্ষীরার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক Original idea ছিল (নূতন নূতন ভাব উদয় হইত) তাহাই সম্পন্ন করিতে যাইয়া তিনিও যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সভাগৃহ, সূত্রসঞ্চার তার, সূতার Telegraphs-এর অদ্ভুত সংস্কার, দিঘি, সুড়ঙ্গ পথ, Unscientific Arch (অশাস্ত্রীয় খিলান), অশ্বত্থগাছের বোয়া নামান প্রভৃতি অনেক খেয়াল ছিল। সাধারণের পানীয় জলে জন্য বৃহৎ দিঘি খনন, নদার উপর সেতু বন্ধন, পাকা রাস্তাও কতকগুলি করিয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রদিগকে ইংরাজি পড়িতে না দেওয়া তাঁহার এক খেয়াল।

তাঁহাদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন, কোন প্রকার ইহকালের ব্যায়ামে বা আমোদে প্রবৃত্ত হইতে দিতেন না। তাহারা তাঁহার প্রদর্শিত রাজ কায়দা শিখিল ও রাজসভা করিয়া জমিদারী কার্য্য চালাইতে শিখিল।

ফলে এই হইল যে তাঁহার লোকান্তর হইলে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র দ্বিগুণ উৎসাহে কতকগুলি অশ্ব খরিদ করিলেন, ও নিজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিলান জমি অদ্ভুতরূপে আবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দেনায় সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। দুরবস্থার একশেষ হইল।

১৮৭৭ সালে এপ্রিল মাসে ভ্রাতা কেশব লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন।

সাতক্ষীরা

১৮৭৮ ডিসেম্বর মাসে খুড়ামহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তিনি যখন হাওড়ায় Dy. Magistrate ছিলেন তখন এক জমি দখল সম্বন্ধে মোকদ্দমা করেন। ঐ মোকদ্দমা High Court এ যায়। সেখানে দেখা গেল যে নথিতে আসল রূবকারি (proceedings) নাই, তাহার স্থানে একটী নকল আছে, ও সেই নকলের তারিখ দেওয়া আছে। বিপক্ষের Counsel তর্ক তুলিলেন যে রূবকারি আদৌ লিখিত হয় নাই, হাই-কোর্টের বিচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। এই তর্কের মীমাংসার জন্য খুড়ামহাশয়কে High Court-এ তলব

করেন। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে আসল রুবকারি লিখিত হইয়াছিল, ও নথিতে ছিল, তাহা কিরূপে নষ্ট হইল তাহা তিনি বলিতে পারেন না। জজ বাহাদুর সে কথা বিশ্বাস করিলেন না ও তাঁহার মন্তব্য গভর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্ট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। **Dist. Magistrate**-ও **Judge** বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই অপরাধে খুড়ামহাশয় একশ্রেণী নিম্নে অবনত হইলেন, তাঁহার মাহিনা ৬০০৲ টাকার স্থানে ৫০০৲ টাকা হইল ও তিনি রাঁচী বদ্‌লি হইলেন। কিছুদিন পরে সেই আসল রুবকারি একটী ইংরেজী চিঠির তাড়ার মধ্যে হাওড়া আফিসে আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু সে সময় খুড়ামহাশয়ের এক যুবক বন্ধু Dt. Magistrate-এর ভয়ে উহা প্রকাশ হইতে দিলেন না। এক বৎসর পরে খুড়ামহাশয়ের কাল হইলে ঐ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এ কথা ঐ আফিসের প্রধান ক্লার্কের নিকট আমি পরে জানিয়াছিলাম। এই অপমানে ও মনঃকষ্টে যে তাহার অল্প বয়সে কাল হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। **Dy. Magistrate** সকলেরই এরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমারও একবার হইযাছিল। কোন মোকদ্দমার সময় ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র টেবলের উপরে অসংলগ্ন অবস্থায় থাকে। ঐ সময় একজন কেরাণী কতকগুলি কাগজের তাড়া লইয়া আসিয়া বলিল যে এ কার্য্যটী অত্যন্ত জরুরী। কলেক্টর সাহেব এখনি চাহিতেছেন, একবার দেখিয়া দেন। এই বলিয়া

কাগজের তাড়াগুলি সম্মুখে রাখিল। পরে উঠাইয়া লইবার সময় একখানা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ ঐ সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যাইবে ইহা বিচিত্র নহে।

সাতক্ষীরা থাকিতে অনেকবার জ্বর হইয়াছে, কিন্তু জ্বরে প্রায় শয্যাগত হইতাম না। অল্প জ্বর হইলেও অশ্বারোহণে মফঃস্বলে যাইতাম, ও কার্য্যাদি করিতাম। তবে পরে জানিয়াছিলাম যে দুইজন Subdl. Officer আমার বিপক্ষে লিখিয়াছিলেন যে আমি অলস। তাঁহারা আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্বন্ধে কখনও কোন পরামর্শ দিতেন না, চাহিলেও পাইতাম না। তাঁহারা দুইজনই অত্যন্ত স্বার্থপর ও সর্ব্বদাই সাহেবের নাম শুনিলে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। একজন Asst. Superintendent of Police থানায় কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আসিলে দরবারী পোষাক পরিধান পূর্ব্বক সেলাম করিতে ছুটিতেন। কিরূপে সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে ইহাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান চিন্তা।

এরূপ লোকের অধীন থাকিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ। যদি তাঁহারা অক্ষম হইতেন, তাহা হইলেও কতক সম্ভব হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা অক্ষম নহেন। উভয়ই উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের সময়ে আমি অক্ষম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলাম। সর্ব্বদা নিজের প্রতিপত্তির জন্য যাহারা ব্যস্ত তাহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর অবস্থা অনুধাবন করিতে অবসর পায় না।

১৮৮২ সালে জুলাই মাসে বাঁকপুরে Cess Revaluation

কার্যে Special Dy. Collector বহাল হইলাম। Gazette হইবামাত্র অনুজ্ঞা পাইতে বিলম্ব না করিয়া সাতক্ষীরা ত্যাগ করিলাম; পরিবার মাগুরায় মেজদাদার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। গভর্ণমেণ্টের এক Circular ছিল যে Gazette হইবার ৭ দিন মধ্যে কর্ম্মচারিগণ হুকুম তামিল করিতে বাধ্য; লিখিত আজ্ঞা পাউক বা নাই পাউক।

এদিকে Commissioner Monro সাহেব অনুজ্ঞাপত্র বন্ধ করিলেন ও যখন শুনিলেন যে আমি পলাইয়াছি তখন রাগ করিয়া Subdl. Officerকে অনুযোগ করিলেন।

যদি অগ্রে না পলাইতাম তবে কমিশনার আমায় এ চাকরি লইতে নিশ্চয়ই দিতেন না। আমার ভাগ্য অন্যরূপ হইত। ইহাও জীবনের এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কলিকাতায় আসিয়া চিফ্ সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। Special Dy. Collector চাকরি Subdy. হইতে উন্নতি নহে। উহাতে Deputy Magistrate-এর কোন দাবী চলে না। তিন মাসের জন্য ঐ চাকরি খালি হইয়াছিল। আমি অনুনয় করিলাম কেবল তিন মাসের জন্য অতদূর যাইলে আমার সমূহ ক্ষতি হয়। তাহাতে সাহেব মহোদয় বলিলেন, আমার ফিরিয়া সাতক্ষীরায় যাইতে হইবে না।

বাঁকিপুর পৌঁছিয়া গোবিন্দচন্দ্র মিত্রের গৃহে উঠিলাম, তিনি আমার ভগ্নিপতি ও সেখানকার উন্নতিশালী উকিল। তখন বাঁকিপুরে বাসা পাওয়া যাইত না। খুঁজিয়াও পাইলাম না।

কাজেই গোবিন্দ ও কুমুদিনীর অনুরোধে পূজার ছুটী পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৃহেই থাকিতে স্বীকৃত হইলাম। ১৭ই জুলাই সাতক্ষীরা ত্যাগ করি, বোধ হয় ২৪শে জুলাই বাঁকিপুরে পৌঁছি।

জন্মাষ্টমীর ছুটীতে গোবিন্দ আর আমি গয়া ভ্রমণে গেলাম। সেখানে ডাক বাঙ্গলায় উঠিলাম; কিন্তু পরদিন সকালে শুনিলাম ব্রহ্মদেশের রাজদূত ওখানে আসিবেন, আমাদিগের অন্যত্র যাইতে হইবে। কাজেই গোবিন্দের এক বন্ধু এক মুন্‌সেফের বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। সেদিন রাত্রে ওখানকার বাঙ্গালী বাবুরা আমাদিগকে তাঁহাদের Club-এ নিমন্ত্রণ করিলেন। Billiard নাচ ও আহার হইল। মদ বেশ্যাও ছিল। তখন Club একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে হইত।

ভাগ্য পরিবর্ত্তন

বাঁকিপুরে এক মাস মাত্র যাপন করিয়া শুনিলাম আমি যাঁহার স্থানে আসিয়াছি, তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। ইহা শুনিয়া মন অত্যন্ত নিরাশ হইল। Secretary Peacock সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম যে তিনি আশা দিয়াছিলেন আমাকে তিন মাস পরে সাতক্ষীরায় ফিরিয়া যাইতে হইবে না এখন দেখিতেছি দুই মাস না যাইতে আমাকে ফিরিতে হয়। ইহা আমার পক্ষে সমূহ দুঃখজনক। তাহার পরের সপ্তাহের Gazetteএ এক হুকুম হইল যে আর একজন ডিপুটী যিনি ভূমিক্রয় কার্য্যে যাইতেছেন

তাঁহার স্থানে আমি Offg. Dy. Magistrate নিযুক্ত হইলাম এবং ছাপরা মোকামে যাইতে হইবে। Commissioner লিখিলেন যে আমার স্থানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রত্যাগমনের কারণ নাই ও আমাকে ছাপরায় যাইতে হইবে না। আমি বাঁকিপুরে Special কার্য্যেই থাকিব।

আমি Offg. Dy. হইয়া Departmental সমস্ত পরীক্ষা একবারেই উত্তীর্ণ হইলাম। আমাব মাহিনা ২০০৲ টাকা হইল। আমিও Subdy. হইতে পরিত্রাণ পাইলাম বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বৎসর পরে যখন ঐ কার্য্য শেষ হয় তখন একবার কলিকাতায় যাইয়া Peacock সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন আমি Special Deputy আছি ; এবং ঐ কার্য্যে তিনি আমাকে আরও দিবেন। আমার আর Sub. Deputy হইতে হইবে না। তাহা শুনিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি একপ্রকার বিহ্বল হইয়া তাঁহার দরবার হইতে উঠিয়া আসিলাম ও সেই সময় যে International Exhibition হইতেছিল সেখানে যাইয়া ঘুরিতে লাগিলাম, মন উদাস ও নিস্তেজ। এক ঘণ্টা পরে মনে হইল Peacock সাহেব ভুল বুঝিতে পারেন, একবার Bengal Officeএ যাইয়া সন্ধান নেওয়া যাউক। সেখানে যাইয়া শুনিলাম Peacock সাহেব ভুল করিয়াছেন। আমার নাম দস্তুরমত Deputy Magistrateদিগের মধ্যে Enroll হইয়াছে, আর বদল হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই অবধি আর Peacock সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। এখন

পাঠক দেখ আমাকে কে Subdeputy হইতে উদ্ধার করিল? কোন ব্যক্তি করে নাই। ভাগ্য ভিন্ন আর কে হইতে পারে? আমি ভাগ্য মানি না, ভগবানেব অনুগ্রহই আসল।

বাঁকিপুর

বাঁকিপুবে ভাড়াটে বাড়ী কিছুতেই পাওয়া যাইতেছে না। পরিবারগণ মাগুরায় মেজদাদার বাসায়, সেখানে সুরেনের remittent fever। শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী, মেজ, ও ন বৌ, ও তাঁহার পুত্র ফণীন্দ্র ছিল। গৃহিণী সেখানে বাস করিতে আদৌ অনিচ্ছুক। কারণ মধ্যম বধূ পুত্রহীনা, তিনি ত সন্তানগণের উৎপাত সহ্য কবিতে অপারগ, আর তিনি নানা কাবণে বিশেষ অপুত্রক বিধায় পুত্রবতী গৃহিণীর প্রতি সাধারণতঃ বিমুখ।

পূজাব ছুটী হইলে গোবিন্দ ও আমি ভ্রমণে বাহির হইলাম। প্রথমে বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। সেখানে দুর্গাকান্ত একটী জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহাব ওখানে একদিন থাকিয়া কলিকাতায় গেলাম। পরদিন কৃষ্ণনগর যাইয়া শুনিলাম, দাদা ও বেণীবাবু কলিকাতায় গিয়াছেন, পরদিন আবার কলিকাতায় আসিলাম। দাদা, গোবিন্দ, বেণীবাবু (বেণী মাধব মিত্র, Sub-Judge) ও উমেশচন্দ্র ঘোষ উকিল তাঁহারা পশ্চিমে ভ্রমণে বাহির হইলেন। আমি একা সেখানে থাকিলাম। তিন দিন পরে আমার শ্বশুর

মহাশয় আমার পরিবার সহ কলিকাতায় পৌছিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত বাঁকিপুর আসিলাম। একটা ক্ষুদ্র বাসা, উপরে ২টী কোঠাঘর ও নীচে একটা ঘর রাস্তার ধারে পাইলাম। সেখানে অতিকষ্টে দুইমাস অতিবাহিত করিয়া আবার আর একটী প্রায় সেই রকম কোঠাবাড়ীতে গেলাম। মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক প্রকার চলিল। কিন্তু ঐ মাসে কোঠাঘর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। দিনে উপরে যাওয়া অসম্ভব। নীচে এত মাছির উপদ্রব যে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্ধকার গৃহে না থাকিলে চলে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরি, সন্তান ৩টীকে লইয়া কিরূপে বাস করা যায়! দিনে আহারাদির পর গৃহিণীকে সন্তানদের সহিত গোবিন্দের বাড়ী পাঠাই। কিন্তু গোবিন্দের বৃদ্ধ পিতা তাহাতে বিরক্ত হয়েন। এই অন্ধকার কূপে সমস্ত দিন কিরূপে চলে! সকালে কাছারী, বেলা ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত। পরে সমস্ত দিন অন্ধকারে বসিয়া থাকা। রাত্র ৯টার পূর্ব্বে উপরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল ৯টার মধ্যেও ঠাণ্ডা হয় না। ১০টা, ১১টা পর্য্যন্ত নীচে থাকিতে হয়। অকূল পাথারে পড়িলাম। এই কষ্টে বাস করা না চাকরি পরিত্যাগ করা? ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় নিরাশার উপর আশা করিয়া বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। হঠাৎ একটা বাঙ্গলা পাইলাম। ঘরগুলি বড় বড়, ৪।৫টা কুঠরি, ছাদ তক্তার উপর খাবরা। বড় রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়া। ২০৲ টাকা ভাড়া। ঐ বাড়িতে ১৮৮৩ এপ্রিল হইতে ১৮৮৪ মে পর্য্যন্ত ছিলাম।

রাজগৃহ

১৮৮৩ নভেম্বর মাসে মহরমের সময় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বেহার যাত্রা করিলাম। সঙ্গে পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন বাঁকিপুরে নূতন উকিল। পরে যশোহরের District Judge ছিলেন।

বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে সকালে এক্কাগাড়াতে দুইজনে উঠিয়া ১১টার সময় বেহার ডাক বাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। খানসামা বেটা জঘন্য খাদ্য দিল। সেখান হইতে বেইলী (Baily) সরাই নামে বৃহৎ গৃহে যাইয়া আড্ডা করিলাম। আমার সঙ্গে আমলা ও চাকর ছিল। বাজগৃহ যাইবার জন্য যান খুঁজিলাম, কিছুই পাইলাম না। মহরমের জন্য পাল্কী, বেহারা পাওয়া গেল না। অগত্যা আবার এক্কাগাড়ীতে উঠিতে হইল। রাজগৃহে Inspection Bungalow ছিল, খাটিয়া ছিল, কিন্তু লোক ছিল না, আমরা বলপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া আড্ডা লইলাম। উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখিলাম। বিকালে সেখানে বা নিকটে কোথায়ও মানুষ দেখা গেল না। নূতন রাজগিব অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, পুরাতন রাজগৃহে লোকালয় নাই তবে অনেকস্থলে উষ্ণ প্রস্রবণ ও গাছ আছে, সকালে যাত্রীরা আসে, পাণ্ডারাও আসে। একটা প্রস্রবণে মুসলমান দরগা আছে, সেই দরগা রক্ষক বোধহয় সর্ব্বদাই থাকে।

পরদিন সকালে একজন পাণ্ডাকে ধরিয়া বিভার পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। কতকগুলি জৈন মন্দির আছে। কোন

কোনটীতে সুন্দর পঙ্খের কাজ করা। একটা মন্দির ভাঙ্গা পড়িয়া আছে, তাহার স্তম্ভগুলি কাল ও সাদা মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত, অত্যন্ত মসৃণ, চক্ চক্ করিতেছে। প্রত্যেক মন্দিরে বাতি জ্বালা হয়, দুই একটা ফুলও পড়ে। একজন ব্রাহ্মণ আছে, সে জৈনদিগের পুরোহিত। সে প্রত্যহ ঐ কার্য্য করে। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া একদিক্ দিয়া নামিতে গেলাম, পাহাড়ের উচ্চস্থান, বৃক্ষ তৃণ-বিহীন, কেবল প্রস্তর ভিন্ন আর কিছুই নাই। একটী নিম্নস্থানে কতকগুলি তৃণ দেখিলাম। খানিকদূর নামিয়া দেখি একস্থানে একখানা পাথর ৩।৪ হাত উচ্চ, একেবারে খাড়া, যৎসামান্য যে ধার আছে, তাহাতে পদ রাখা যায় না। পাণ্ডা ও পঙ্কজবাবু সড় সড়্ করিয়া নামিয়া গেলেন, আমি ত নামিতে পারি না। আমার বোধ হইল যে সড়্ সড়্ করিয়া নামিয়া যেখানে দাঁড়াইতে হইবে সে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান, কেবল একখানি পদ রাখিবাব অবসর আছে। যদি ঝোঁক না সামলাইতে পারি তবে একেবারে ৫০।৬০ হাত নীচে পড়িয়া যাইব। পরে বুট খুলিলাম, সঙ্গীরা উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যুবা পুরুষ, ও পাতলা। অনেক চিন্তার পর অবশেষে নামিয়া পড়িলাম। নীচে নামিয়া দেখি সনভাণ্ডার গুহা, কিম্বদন্তি আছে এই যে ঐ গুহা জরাসন্ধের ধনাগার ছিল। গুহাব মধ্যে—বিচিত্র কাজ করা, ও একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজিত। সেখানে খানিক বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বকালের রাজগৃহ নগব, এখনকার বন-জঙ্গলের, ভিতর দিয়া বাসায় পৌঁছিলাম। রৌদ্র প্রখর, গরমও যথেস্ট।

ঝরণার জল অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু, কিন্তু অত্যন্ত গরম। অনেকগুলি ঝরণা দেখিলাম। সবগুলিই যথেষ্ট গরম। স্নান করিয়া আরাম হইল না। মুসলমানের ঝরণা সর্ব্বাপেক্ষা কম গরম। আমরা যে দু'দিন ছিলাম, কেবল অড়হরের ডাইল আর ভাত ভিন্ন কিছুই খাদ্য পাই নাই, ভাতের এক অনুপান যথেষ্ট কাঁকর।

মৌলভী আব্দুল জব্বার পরে নবাব হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইল, তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। কাছারা যাইবার সময় তাঁহার সহিত যাইতাম।

১৮৮৪ সাল মার্চ মাসের শেষে আমার Revaluation work শেষ হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র Entrance-এ ফেল করিয়া ১৮৮৩ সালে বাঁকিপুর গেল। ১৮৮৪ সালে Entrance পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল।

Road Cess revaluation work-এ জমিদারদিগকে জরিমানা করিতে হইত। দিন একটাকা বা দুইটাকা করিয়া জরিমানা হইত। এইরূপে ৫০,০০০৲ হাজার টাকার অধিক জরিমানা করি। সুখের মধ্যে মাপ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল। সমস্তই মাপ করিতাম, এক পয়সা আদায় করি নাই।

একজন মুসলমান মুহরারের স্ত্রীর ৬০০০৲ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা আদায়ের জন্য Certificate হইল, পরে নিলাম ইস্তাহার হইল। ঐ মুহরারই Certificate clerk। যখন নিলাম

ইস্তাহার লিখিয়া দস্তখত করিতে আমার নিকট আনিল, তখন তাহার জ্ঞান হইল যে তাহার নিজের সম্পত্তি নিলাম হইতে যায়।

আর একজন জমিদার যিনি ছাপরা জেলায় আমারই ন্যায় Revaluation work করিতেছিলেন, তাঁহারও ৩০০০৲ টাকা জরিমানা হয়। তখন তিনি হিসাব দাখিল করিয়া মাপ প্রার্থনা করিলেন, মাপ করা হইল, পরে শুনিলাম তিনি ছাপরা জেলায় জমিদারদিগের নিকট ১৪,০০০৲ টাকা জরিমানা আদায় করিয়াছেন। তাঁহার জরিমানা মাপ করিয়া মনে কস্ট হইয়াছিল।

একদিন খগৌল ষ্টেশন হইতে কোন গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে Sone canal-এর গেট দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দুইটা দরজাদ্বারা খাল একস্থানে বন্ধ, বড় বড় নৌকা এই দুই গেটের বাহিরে। একদিকের জল ১০।১২ হাত উচ্চ, অন্যদিকেব জল ততদূর নীচে। দুই দ্বারের মধ্যে সামান্য জল আছে। উপরের দরজা দু'তালা ক্রমে খোলা হইল, অভ্যন্তর ভাগ জলপূর্ণ হইয়া গেল, নৌকাগুলি সেখানে প্রবেশ করিল, দরজা বন্ধ হইয়া গেল। পরে নীচের দরজা দু'তালা ক্রমে খোলা হইল, জল বাহির হইতে লাগিল, নৌকাও ঐ সঙ্গে নামিতে লাগিল, নীচের জলের সঙ্গে সমান হইলে নৌকা বাহির হইয়া আসিল। ফিরিবাব সময় যখন খগৌল (Dinapur) ষ্টেশনে পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে, আর ট্রেন নাই। রাত্রি

অন্ধকার, Cantonment-এ গেলে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, অন্ধকারে একা দানাপুরে পৌঁছিলাম, গাড়ীর সন্ধান করিয়া একখানা গাড়ী পাইলাম। গাড়োয়ান বলিল তাহার ঘোড়া বিশ্রাম না করিলে যাইতে পারিবে না। ২।৩ ঘণ্টা পরে যাইবে। অজ্ঞাত স্থান, অন্ধকার, একলা, অগত্যা সেই আস্তাবলের কাছে পথে পা-চারি করিতে লাগিলাম। প্রায় রাত্রি ১০টার সময় গাড়ী প্রস্তুত হইল, তখন বাঁকিপুরে চলিলাম, রাত্রি ১২টার সময় পৌঁছিলাম।

সাতক্ষীরার বাড়ী আমার খুড়তুত ভাই বিভূদাকে ১৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, মূল্য ক্রমে দিবার কথা ছিল। সে L. M. S. পাস করিয়া সেখানে ডাক্তারি করিতে যায়। সে অত্যন্ত দয়ালু ও নিঃস্বার্থপর লোক ছিল। রোগীর শুশ্রূষা করিতে ভালবাসিত। শীতকালে একগ্রামে কোন এক বালকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া রাত্রে তাহার শুশ্রূষা করিয়া নিজে Pneumonia লইয়া সাতক্ষীরায় আসিয়া দেহত্যাগ করে। পরে আর এক ব্যক্তি ঐ বাড়ী ক্রয় করে। তাহার নিকট মূল্য আদায় করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

১৮৮৪ সালে মে মাসে গয়াতে বদ্‌লি হইলাম।

গয়া, মে ১৮৮৪ হইতে মে ১৮৮৬

গয়াধামে একটী দোতলা ক্ষুদ্র বাড়ী পাইলাম। অত্যন্ত গরম। দ্বারে শার্সি খড়খড়ি ছিল না। গরমের সময় অত্যন্ত কষ্ট হইত। গৃহস্বামী একজন বাঙ্গালী উকিল। তিনি প্রথমে বলিয়াছিলেন গৃহ ভাল করিয়া দিবেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। কেবল ভাড়া বৃদ্ধি করিলেন। মধ্যে একমাস যাইয়া এক বাগানবাড়ীতে ছিলাম। পরে ঐ দুষ্ট উকিলের বাড়ী ত্যাগ করিয়া এক পণ্ডিতের পুরাতন বাড়ীতে ৫।৬ মাস ছিলাম। তারপর এক মুসলমানের দুই তলা বাড়ী পাই। সেখানে এক বৎসর ছিলাম। মাতাঠাকুরাণী তীর্থ ভ্রমণে যাইয়া গয়ায় ছিলেন। ন বউ তাঁহার পুত্র লইয়া কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার পুত্র ফণীকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। তাহার শরীর দুর্ব্বল বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতাম। কিন্তু তাহার মার মন অস্থির, অল্পদিন পরেই চলিয়া আসিল।

আমার দ্বিতীয়া কন্যা উষাপ্রভা ২০ এপ্রিল ১৮৮১ সালে জন্মে। তাহার দুই দিন পরে দাদার স্ত্রী, মেজবৌ ও তাঁহার মাতা তীর্থ পর্য্যটনে ওখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় মাতাঠাকুরাণী ওখানে ছিলেন। গয়া অতি সুন্দর স্থান, বিশেষ বর্ষাকালে। পাহাড় ও উপত্যকা সকল অতি সুন্দর দেখায়। এমন সুন্দর স্থানে আর কখনও থাকি নাই।

পাহাড়ের সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকারী। অবশ্য দার্জ্জিলিং অতি মনোরম স্থান। কিন্তু বর্ষাকালে গয়া স্থানে স্থানে অতি সুখকর বলিয়া বোধ হয়।

গয়ায় একটী Billiards Club ছিল। সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ সেখানে খেলা হইত আর অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইত।

গয়ায় Excise, Land acquisition, Road cess, Certificate কার্য্য করিতে হইত। ইহা ভিন্ন ফৌজদারি মোকদ্দমা যথেষ্ট ছিল।

গয়ার আবগারী কার্য্য অতি বৃহৎ; তখন বৎসরে সাত লক্ষ টাকা আয় ছিল। পর বৎসর Out Still System বাহির ভাটা বন্দোবস্ত উঠিয়া গেল। নূতন Distillery প্রস্তুত করিলাম। একজন কুর্মি সবডিপুটী Distillery Superintendent হইলেন ও একজন লালা clerk বহাল হইল। ঐ লালা মাতাল ছিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে শুঁড়িরা মদে চিনি মিশায়, ও সেজন্য মদ ভারী হওয়ায় ট্যাক্স কম লাগে। মদ পরীক্ষা করিবার সময় আস্বাদ লইলেই বোঝা যায় যে তঞ্চকতা করিয়াছে কিনা। Subdy. বলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে দিব্য দেওয়া আছে যে তাহাদের মদ মুখে দিতে নাই। আমি যদিও প্রত্যহ একবার দেখিতে যাইতাম, কিন্তু মদ বাহির করিবার সময় থাকিতাম না। আমিও মদ খাই না, আর ঐ চোলাইয়ের কাণ্ড দেখিলে ঐ জিনিষ মুখে

দিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। কালেক্টর সাহেব শুনিয়া ভারী খাপ্পা, বলেন "তাঁহার Deputy, Sub-Deputy কেহ মদ স্পর্শ করিবে না, কিরূপে কাজ চলিবে?"

আমি Road Cess Deputy Collector, সেজন্য Road Cess Committee-র Member-ও ছিলাম। অল্পদিন Vice-Chairman-ও ছিলাম। District Engineer একজন সাহেব ছিল, সে যাহা ইচ্ছা করিত, তাহার প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। তাহার ইচ্ছা হইল সমস্ত টাকাই কাঠের পুলে খরচ করিবে। রাস্তাঘাট সব বন্ধ হইয়া গেল। ৭০।৮০ হাজার টাকা খরচে এক একটী কাঠের সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এক Sub Committee হইল, তাহাতে সরকারি উকিল, আমি, আর একজন বাঙ্গালি জমিদার মেম্বর, আমাদের কার্য্য বাৎসরিক খরচের তালিকা পরীক্ষা করা। আমরা বলিলাম তিনটা কাষ্ঠ সেতুর স্থানে দুইটা হউক, বাকী টাকাদ্বারা নিতান্ত আবশ্যকীয় রাস্তা প্রস্তুত হউক।

পরে Committee meeting দিনে দেখি, যে কয়জন European member ছিল, Civil Surgeon, Manager, Planter প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। প্রথমেই প্রস্তাব হইল যে Engineer যে বাজেট করিয়াছেন তাহাই স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হউক।

Magistrate—"ডাক্তার তুমি এই প্রস্তাব কর।"

Doctor—"হাঁ, আমি করিতেছি।"

Magistrate—"সরকারি উকিল, তুমি ইহা অনুমোদন কর।"

Govt. Pleader—"হাঁ, আমি অনুমোদন করি।"

Magistrate—"আর কাহারও কোন আপত্তি আছে?"

Govt. Pleader—আমার কানে কানে—"চুপ্ কর, কথা ব'ল না, দেখ্‌ছ না কি কাণ্ড!"

বাঙ্গালি জমিদার—"Sub Committee যাহা স্থির করিয়াছেন, আমি সেই প্রস্তাব করি।"

Magistrate—"কে তোমার অনুমোদন করিবে?" সকলেই নিস্তব্ধ, meeting শেষ হইয়া গেল।

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া কয়েকবার দেখিতে গিয়াছিলাম। বাঁকিপুর থাকিতে একবার ও গয়া থাকিতে তিন চার বার।

প্রথমবার দেখিলাম জঙ্গলে পূর্ণ, মন্দির ভগ্ন, ভিতরে যাইবার উপায় নাই।

পরে গভর্ণমেণ্ট হইতে বেক্লার সাহেব ঐ মন্দিরের মেরামত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে খুঁড়িয়া ৮।১০ ফিট নামিয়াছিলেন। সেকালের দেওয়াল বাহির হইল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গেল। বাঁশের ভারা বাঁধা হইল,

বাঁশের সিড়ি ঘুরিয়া উপরে উঠিল, স্ত্রী-কুলীরা মালমশলা লইয়া স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিতে লাগিল, মন্দির সংস্কার হইল। দ্বিতীয় তলে বজ্রাসন পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি নাই। ঐ বৃহৎ মূর্ত্তি মঠের মোহন্ত গৃহে রক্ষিত ছিল। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পড়িল, তখন মোহন্ত মহাশয় ঐ মূর্ত্তি নিজালয়ে নিয়া রাখিলেন। মোহন্ত বড় জমিদার, তাঁহার ভৃত্য কৃষক গোরক্ষক সকলেই সন্ন্যাসী; অর্থাৎ কেহই দারপরিগ্রহ করে না ও সকলেই গেরুয়া বস্ত্র পরে। মোহন্ত ঐ মূর্ত্তি ফেরত দিতে নারাজ। গভর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেন তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। বেক্লার সাহেব আমাদের কাছে বলিলেন যে তাঁহার মনোগত ইচ্ছা নহে যে ঐ মূর্ত্তি মন্দিরে আনা হয়, কারণ তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি পাইয়া যুবা সিভিলিয়ানগণ বুদ্ধের প্রতি অভক্তি করিবে ও তাঁহার উদরে পিস্তলের গুলি ঠিক চালাইতে অভ্যাস করিবে। পুরাতন মন্দির ইষ্টকের, গাঁথুনি বোধ হয় কাদা ও চুণ দিয়া সংযুক্ত। এখন চূণ, সুর্কি ও বিলাতী সিমেণ্ট দিয়া সংস্কার হইল ও অল্পদিন মধ্যে লোণা ধরিতে আরম্ভ করিল। অনেক মূর্ত্তি লুট হইয়া গেল। আমিও একটী আনিয়াছিলাম ও মেরামত করিয়া দাদাকে উপহার দিয়াছিলাম।

টিকারির রাজ

সে সময় টিকারির রাজ্যাধিকারিণী বাধেশ্বরী কিশোরী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার দুইটী সন্তান ছিল, ও তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই সময় তাঁহার সহিত তাঁহার স্বামীর বিবাদ আরম্ভ হয়। ঐ বিবাদে Collector Bolton সাহেবও যোগ দিলেন। রাণী নিজেই জমিদারির কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার স্বামী নির্ব্বোধ, এজন্য তাঁহার কোন সহায়তা লইতেন না। জহুরিলাল নামে এক ব্যক্তি নায়েব দেওয়ান ছিল, সেই প্রধান কর্ম্মচারী, তাহার প্রতি রাণী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। সে ব্যক্তি রাণীর স্বামীর সঙ্গে যোগ দেয়। রাণী জহুরিলালের নামে হিসাবের নালিশ করেন, দাবী তিন লক্ষ টাকা। জহুরিলাল জবাব দাখিল করিতে বাধ্য হইয়া যে হিসাব প্রস্তুত করে তাহাতে গয়ার ভূতপূর্ব্ব জজ সাহেবের নামে ৮০,০০০৲ টাকা ঘুষ লেখা হয়।

কালেক্টর সাহেব বলেন ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া নেওয়া হউক, জহুরিলাল পুনঃ বহাল হউক ও বাবুসাহেব (রাণীর স্বামী) প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত হউক। রাণী জহুরিলালকে ফেরত লইতে বা বাবুসাহেবকে প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে সম্পূর্ণ নারাজ।

একদিন প্রত্যূষে কালেক্টর সাহেবের এক পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি টিকারি যাইতেছেন, রাণী গয়াতে

আছেন। রাণীর নামীয় এক পত্র আমাকে দিয়াছেন। আর হুকুম দিয়াছেন যে ষ্টেটের সমস্ত সম্পত্তি যাহা গয়ায় আছে তাহা আমার ক্রোক করিতে হইবে। আমি প্রথমে ভাবিয়া পাইলাম না কিরূপে একার্য্য সম্পন্ন হইবে। এক আর্দালি ভিন্ন আমার নিজ অধীন কর্ম্মচারী কেহ নাই। আমাকে যদি রাণী অগ্রাহ্য করেন তবে আমার কি ক্ষমতা যে রাজবাড়ী যাইয়া কোন কথা বলি। ভাবিলাম রাজবাড়ী যাইয়া বাণীর সাহায্য পাইব। পথে আবগারীর ইন্‌স্পেক্টরকে পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। রাজবাড়ী পৌঁছিয়া শুনিলাম বাবুসাহেব কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে রাত্রেই টিকারি গিয়াছেন, ও রাণী টিকারি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, গোশকটে মাল বোঝাই হইতেছে।

আমি পৌঁছিয়া অন্দর মহলে সংবাদ দিলাম ও কালেক্টর সাহেবের পত্র পাঠাইয়া দিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে একটী লোক ঐ পত্র লইয়া বাহিরে যাইতেছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল পত্র লইয়া মোক্তারের গৃহে যাইতেছে, সেখান হইতে পত্র পড়াইয়া আনিয়া তবে উত্তর দেওয়া যাইবে। আমি বলিলাম যে অনেক বিলম্ব হইবে, যদি রাণীজির হুকুম হয় তবে আমি পত্র পড়াইয়া শুনাইতে পারি। সে ব্যক্তি অন্দরে প্রত্যাগমন করিল ও ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিল। আমি একাই ভিতরে যাইলাম, একখানা চৌকিতে বসিলাম, নিকটে দুই সুন্দর বালক বালিকা খেলিতে-ছিল। রাণীজি পর্দ্দার ভিতর ছিলেন। আমি তাঁহার অনুজ্ঞা

লইয়া পত্র খুলিয়া হিন্দিতে পত্রমর্ম্ম অবগত করাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল গভর্ণমেণ্ট বা বোর্ড তাঁহার কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া ষ্টেটের ভার নিজহস্তে লইলেন, তাঁহাকে এই কষ্টদায়ক কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইল। ষ্টেটের আয় তিনি পাইবেন। ইহার তহবিল প্রভৃতি আমাকে সমর্পণ করিবেন। শুনিয়া রাণীজি ক্রোধে বিকৃত স্বর করিয়া বলিলেন, কালেক্টর আমাকে কিসে অনুপযুক্ত জানিলেন, খাজনা পথকর প্রভৃতি সমস্তই উপযুক্ত সময়ে দাখিল করিতেছি, আমার শত্রুপক্ষের কথা শুনিয়া তিনি এরূপ অত্যাচার করিতেছেন, ইত্যাদি। তাঁহার বাক্যস্রোত অবসান হইলে বলিলাম এখন আমার যাহা কর্ত্তব্য করিতে হইবে। তিনি উত্তর করিলেন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, আমলারা আছে, তাহাদের নিকট হিসাবপত্র আছে ও হুকুম করিলেন যে আর টিকারি যাওয়ার প্রয়োজন নাই। জিনিষপত্র গাড়া হইতে নামাইয়া নেওয়া হউক। আমি বাহিরে আসিয়া আমলাগণকে তলব দিলাম। জানিলাম তহবিলে সামান্য টাকা আছে, তাহা নিজ তহবিল কি ষ্টেটের অর্থ তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তাহাতে হাত না দিয়া, গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, উষ্ট্র গরু প্রভৃতির এক তালিকা প্রস্তুত করিলাম ও প্রত্যেক বিভাগের দারগার জিম্মা করিলাম। ইতিমধ্যে ভিতর হইতে হুকুম হইল যে গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি কোন যান বাবুসাহেবের জিম্মা না হয়, তিনি কোন যান ব্যবহার করিতে পাইবেন না। আমি উত্তর দিলাম সকলই

তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের জিম্মায় থাকিল, বাবুসাহেবের প্রতি কোন হুকুম প্রচার করা আমার কার্য্য নহে। ঐরূপে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে তিনি বৃথা টিকারি গিয়াছিলেন, মালখানার চাবি রাণীর হাতে, তাহা অভাবে মালখানা খোলা যায় নাই। আমাকে বলিলেন তুমি রাণীর নিকট হইতে মালখানার চাবি আদায় করিয়া আন। আমি প্রথমেই বলিলাম রাণীর যেরূপ ভাবগতিক তিনি আমাকে কখনই চাবি দিবেন না, আপনি গেলেই ভাল হইত। তিনি তাহা শুনিলেন না। আবার রাজবাড়ী চলিলাম, বাবুসাহেবের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহাকে বলিলাম চাবি আনিয়া দেন। তিনি বলিলেন তিনি অক্ষম, অন্দরে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি ও আমি একত্র ভিতরে গেলাম। যাইয়া আমার প্রয়োজন জানাইলাম, ও তাঁহাকে বুঝাইলাম যে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। কেবল তাঁহার কষ্ট নিবারণের জন্য যত্ন হইতেছে। তিনি টিকারি যাইয়া যেমন রাণী ছিলেন সেইরূপ বাস করুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন আর জন্মে টিকারি যাইবেন না। সেখানে যাইয়া কি তিনি চামারনী হইয়া রাস্তা ঝাড়ু দিবেন। চাবি সম্বন্ধে বলিলেন যে কালেক্টর সাহেব নিজে না আসিলে তিনি চাবি দিবেন না। তিনি পর্দ্দার ভিতর অন্য ঘরে ছিলেন, কোনরূপে জানিতে পারিলেন যে বাবুসাহেব আমার সঙ্গে আছেন, অমনি বাবুসাহেবের প্রতি ভৎর্সনা আরম্ভ হইল।

তিনি আমাকে ইঙ্গিত করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। আমিও পশ্চাৎগামী হইলাম। কালেক্টর সাহেবকে যাইয়া বলিলাম যে রাণী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন 'আমার মাথা ধরিয়াছে,' যাইতে পারিবেন না, আমাকে আবার যাইয়া অনুনয় করিয়া চাবি আদায় করিতে হইবে। এ দিকে গভর্ণমেণ্টে লিখিলেন রাণীর শতাধিক চাকরানী আছে, এতলোক তাঁহার কোন প্রয়োজনে লাগিবে না, জনকতক চাকর চাকরানী হইলেই তাঁহার কর্ম্ম চলিবে, অনেক অন্যায় খরচ লাঘব হইবে। তাঁহাকে মহারাণী না বলিয়া কেবল রাণী বলিলেই চলিবে।

এই বৃথা কার্য্যে আবার রাজবাড়ী গেলাম, কিছুই ফল হইল না, রাণী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। কি করি, আবার Bolton সাহেবের কাছে আসিয়া সংবাদ দিলাম—আর বলিলাম, মহাশয় এ কার্য্যটা বড় ভাল হইতেছে না। অন্তঃস্বত্ত্বা যুবতীকে এরূপ বিরক্ত করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বারাণ্ডায় মেমসাহেবও তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া। Bolton সাহেব উত্তর করিলেন—ও অতি কদর্য্য স্ত্রীলোক—তোমরা ত' হিন্দু, একজন স্ত্রী তাহার স্বামীর অবাধ্য হয় এ হিন্দুশাস্ত্রে অত্যন্ত অন্যায় নহে কি? আমি বলিলাম—ওর স্বামী কি মানুষ, ও একটা Idiot, তিনি বলিলেন, না, না, তুমি তাহাকে চেন না। প্রথম দেখিলে নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান লোক, আর ও স্ত্রীলোকের স্বভাব কখনই ভাল নহে—she

would fling herself into the arms of any young man who comes across her—ইত্যাদি, আমি তখন আর কি উত্তর দিব—রাজবাড়ীর কোন সংবাদ অগ্রে রাখিতাম না। কিন্তু ও-কথা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। পরে Collector সাহেব একদিন রাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন, কিন্তু চাবি পাইলেন না। ইহার অল্পদিন পরে কালেক্টর তালা ভাঙ্গিয়া মালখানা হইতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বাহির করিয়া আনিলেন। ঐ সকল দ্রব্য গয়া কালেক্টরীর একটী কুঠরিতে মজুত ছিল, তাহার চাবি Rattray বলিয়া এক ফিরিঙ্গি Deputy Magistrate-এর কাছে থাকিত। একমাস পরে কলিকাতা হইতে এক সাহেব জহুরি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন সমস্ত প্রস্তর হীরা মাণিক্য কৃত্রিম। এদিকে Commissioner বলিলেন রাণীর কোন দ্রব্যাদির প্রতি ও খরচ-পত্রের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। ষ্টেট্ সুবন্দোবস্ত করিয়া যে আয় হয় সমস্তই রাণী পাইবেন। তিনি মহারাণীর কন্যা অবশ্য মহারাণী থাকিবেন। Manager বহাল সম্বন্ধে Collector একজনকে মনোনীত করিলেন, কমিশনার আর একজনকে মনোনীত করিলেন, Board তৃতীয় ব্যক্তির নাম দিলেন, Government ৪র্থ ব্যক্তি এক Planter-কে বহাল করিলেন। রাণী রুগ্না হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ৩।৪ মাস পরে মৃত সন্তান প্রসব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আর টিকারি যান নাই। আমাকে বলিয়াছিলেন টিকারি

যাইয়া কি ঝাড়ুদারনী হইয়া থাকিব, আর কখনও টিকারি যাইব না।

গয়ায় যাইয়া প্রথম ৬ মাস যে বাড়ীতে ছিলাম তাহার ধারের রাস্তা শ্মশানে যাইবার পথ। সেই পথে মড়া লইয়া যাইত। ও দেশে মড়ার সঙ্গে গান বাজনা চলে, একটা সোরগোল হয়। গৃহিণী তাহা শুনিয়া ভয় পাইতেন, দিনে একরকম চলিত, সন্ধ্যার পর তিনি অত্যন্ত ভীত হইতেন ও একা থাকিবার ভয়ে আমার Club-এ যাওয়াতে আপত্তি করিতেন। বলিতে লজ্জা হয়, আমি ঐ বারণ শুনিতাম না। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া Club-এ যাইয়া একটু Billiards খেলা, দশজনের সঙ্গে গল্প করা, ইহা ত্যাগ করিতে পারিতাম না। কেহ পারে কিনা বলিতে পারি না, তবে গৃহে কোনরূপ আমোদ থাকিলে চলিতে পারে, কিন্তু সে বিষয় আমি ও গৃহিণী উভয়েই পরস্পরকে আমোদিত করিতে অক্ষম। তাঁহাকে ইংরাজি পড়ান কাজ ছিল, ঐ সময় তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৮৬ সালের ২০শে এপ্রিল আমার দ্বিতীয়া কন্যা উষাপ্রভা ভূমিষ্ঠ হইল। তখন সকালে কাছারা হইত, অত্যন্ত গরম, মাতাঠাকুরাণী শিখরের দুই পুত্র কন্যা ও মামাত ভগ্নীর সহিত আসিয়াছিলেন। পরে দাদা ও মেজদাদার স্ত্রী, মেজদাদার শাশুড়ী প্রভৃতি আসিলেন। গরমে আমরা ছাত বা খোলা বারাণ্ডায় শুইতাম। প্রসবের ৭।৮ দিন পরে সকলেই চলিয়া গেলেন। মে মাসে হঠাৎ একদিন Gazette এ দেখিলাম আমি কৃষ্ণনগর বদলি হইয়াছি।

গয়ার কতকগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু সেখান হইতে প্রস্থানের পর আর তাহাদের সহিত পত্রাদি লেখা হয় নাই।

বাবু ভূপসেন সিং সরকারী উকিল Municipality-র Vice-Chairman, বেশ বুদ্ধিমান্ ও সৎলোক। বৈজনাথ সিং জমিদার। দুই জনই জাতিতে বাভন—কার্য্যক্ষম, কূটনীতিপ্রিয়, মিষ্টভাষী। ভূপসেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুপস্থিতির অবসর পাইয়া পুরাতন জেলখানার জমি অপ্রকাশ্যে নিলাম করিয়া অল্প মূল্যে নিজে ও বন্ধুগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আর কি করিবেন, কোন হাত নাই।

বিনোদকৃষ্ণবাবু ডাক্তার—বাটী বাগবাজার—অতি সজ্জন।

রাজকিশোর নারায়ণ সিংহ Deputy Magistrate—বেহারী, খুব ভাল লোক, অর্দ্ধশিক্ষিত। তাঁহার বিশ্বাস ছাপার বহিতে যাহা লেখা থাকে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে, পুরাণই হউক বা আরব্য উপন্যাসই হউক। তাঁহার ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা তাঁহার সহিত কথা বলে না, ও নিকটে আসে না, তাঁহাদের বংশে এরূপ দস্তুর নাই। পরিবারগণ অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাস করে। প্রদীপ না জ্বালিলে ঘরের কিছু দেখা যায় না। এই লোকের কন্যা স্কুলে পড়িতে যাইবে ইহা একেবারে অসম্ভব।

একটী মোকদ্দমায় এক ব্রাহ্মণ তাহার ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসিল, তাহার ভগ্নী পাল্কীতে ছিল, সে ভগ্নীকে চিনিতে পারিল না।

এক ব্রাহ্মণের নামে নালিশ হইল যে সে বাদীর পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার কপালে সিঁদুর পরাইয়া দিয়াছে। বালিকা বাহিরে খেলিতেছিল, আসামী হঠাৎ আসিয়া তাহার কপালে সিঁদুর দিল। নালিশ হইল যে বলপূর্ব্বক অবৈধ বিবাহ করিয়াছে। আমি ত সিঁদুর দিলেই বিবাহ হয় এরূপ শাস্ত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে সামান্য আক্রমণের জন্য কিঞ্চিৎ জরিমানা করিলাম।

একজন বানিয়া জমিদারের সহিত আমার আলাপ হয়, সে ক্লাবের মেম্বর, তাহার নিজের গাড়ী ছিল। আমার যখন বাসা খুঁজিতে হইয়াছিল, সে তখন কিছু খরচ করিয়া তাহার বাগান-বাড়ী আমার থাকিবার উপযুক্ত করিয়া দিল। আমি সে বাড়ী যাই নাই। কিছুদিন পরে এক তেলি প্রজা তাহার নামে নালিশ করিল যে ঐ জমিদার অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছে। এমন কি রাত্রে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছে ও তাহার যুবতী কন্যা ও পুত্রবধূকে ধরিয়া আনিয়া কাছারী ঘরে উলঙ্গ করিয়াছে। এই মোকদ্দমা Jt. Magistrate আমার নিকট সমর্পণ করিলেন। আমার তখন Second Class power। আমি যাইয়া Jt. Magistrate-কে অনুনয় করিলাম যে এই মোকদ্দমা আর কাহারও কাছে সমর্পিত হউক। তিনি শুনিলেন না, বলিলেন যে যখন সে আমার আত্মীয়-কুটুম্ব নহে, তখন আমাকেই বিচার করিতে হইবে। কি করি, জমিদার ও তাঁহার প্রধান আমলাকে তলব করিলাম। মোকদ্দমা হইয়া

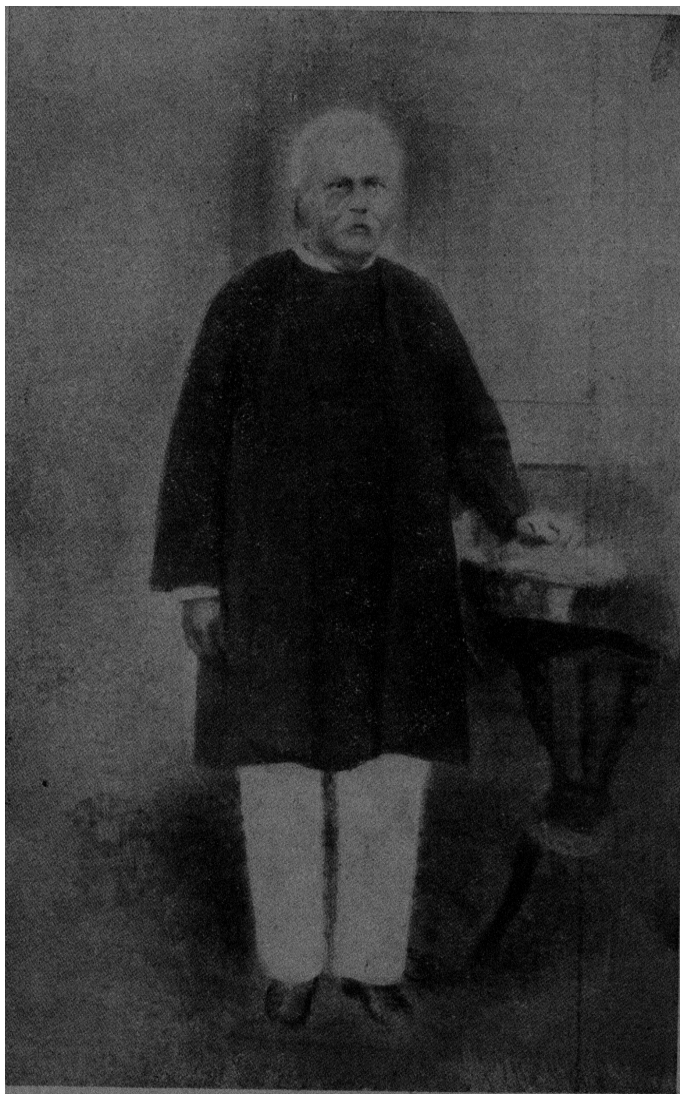
গেল, অনেক অংশ প্রমাণ হইল। আমি দুঃখে ঘাড় হেঁট করিয়া প্রধান অপরাধ সকল বাদ দিয়া কেবল অন্যায় আবদ্ধটুকুর জন্য তাহাকে বিনা পরিশ্রমে একমাস কারাদণ্ড দিলাম। মনে আশা ছিল যে Appellate Court সাজা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তখন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আপিলে ছিল বা অবশিষ্ট গুরুতর অপরাধে পুনর্বিচারে আজ্ঞা দিবেন। Magistrate তাহার কিছুই করিলেন না, কেবল বলিলেন এমন গুরুতর অপরাধে যখন এত স্বল্প সাজা হইয়াছে তখন Deputy Magistrate নিশ্চয়ই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করে নাই,' অতএব বেকসুর খালাস। একদিন সন্ধ্যার সময় বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, ঐ জমিদার আসিয়া উপস্থিত। আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলাম। সে আসিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া এক প্রণাম করিল। তাহাকে বসিতে দিলাম। কিন্তু কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রস্থান করিল।. আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আপিল শুনিবার দিন মফঃস্বলে ছিলেন। সেদিন ঘটনাক্রমে অন্য কার্য্যে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। উকিলের বক্তৃতার পর 'আমার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু এই মোকদ্দমা বিষয়ে আমাকে কোনও কথা বলিলেন না। কথা উঠিলেই আমি মন খুলিয়া সমস্ত বলিতাম, জমিদারও অন্ততঃ এক বৎসর কারাবাস ভুগিত। তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আর কি বলা যাইতে পারে ?

আমি যখন চিন্তা করি তখন ভাগ্য বা অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই মানি না। এই বিশ্বে ভগবানের কাছে সকলেই সমান, একটা পিপীলিকা যে আমিও তাই, কাহারও প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সকলের প্রতি অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিতেছে। তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কিছুমাত্র পাই না। কিন্তু ঘটনাচক্র কখনও কখনও এমন হইয়া যায় যে কেহ অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এ কথাও নিশ্চয়ই সকলে নিজ জীবনে দেখিয়াছেন বা ভোগ করিয়াছেন। তবে কি ভগবান স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ ইতর-বিশেষ করেন, না আধ্যাত্মিক জগতের কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত, সেই নিয়মানুসারে এই আকস্মিক ঘটনা সকল হইয়া থাকে? ফলিত জ্যোতিষ সেই সকল নিয়মাবলীর যৎকিঞ্চিৎ অনুমাত্র অংশ—ঘোর অন্ধকারে জোনাকি পোকার আলোস্বরূপ। সাধকের সাধনার ফল, ভক্তের মানসিক শক্তি, এ সমস্তই ঐ অজ্ঞাত নিয়মাবলীর অধীন। সাধক বা ভক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করুক বা যে কোন জীবকে বা বস্তুকে সাধনা বা ভক্তির যোগ্য বলিয়াই পূজা করুক ফল একই। জীব বা বস্তুই বা বলি কেন মহাশূন্যকেও বৌদ্ধগণ সাধনা বা ভক্তির পাত্র মনে করিতেন। একথা বলায় কেহ যেন না মনে করেন যে আমি বিশ্বাস করি যে সাধক স্বর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ বা মোক্ষ আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি সাধকের এই সাংসারিক অবস্থার বিষয়

চিন্তা করিতেছি মাত্র। আমি নিজেও বিচিত্র ঘটনাবলীর প্রভাবে অনেকবার বিপদ হইতে পরিত্রাণ ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এই জীবনবৃত্তান্তে স্থানে স্থানে লিখিত হইয়াছে। সেজন্য অনুক্ষণ ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। কিন্তু ভাবিয়া পাই না এ অনুগ্রহ আমার ন্যায় নির্গুণ ব্যক্তির পর কেন বর্ষণ হইল। আমি ত সাধনা (শাস্ত্রোক্ত সাধনা) কখনও করি নাই। করিতে প্রবৃত্তি কখনও হয় নাই।

গয়ায় আমার প্রথম শ্বাসকাশি অনুভূত হয়। ১৮৮৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শুষ্ক কাশি। পরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। সিঁড়িতে উঠিতে কষ্ট। গরমের সময় চা পান করিলেই আরও শুষ্ক হইয়া যাইত। প্রথমে ডাক্তারি চিকিৎসা, পরে কবিরাজি চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। ঔষধে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক এক সময় কাছারীতে শব্দনালী বন্ধ হইয়া যাইত, শব্দ বাহির হইত না, নাক দিয়া জল টানিলে তবে সরল হইত। কিছুদিন এই কষ্ট ভুগিয়া সমস্ত ঔষধ সেবন ত্যাগ করিলাম ও ঠাণ্ডা কূপ-জলে তিনবার করিয়া স্নান আরম্ভ করিলাম। তাহাতে ১৫ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলাম। ইহার পর ৮ বৎসর আর রোগ দেখা দেয় নাই।



প্রসন্নকুমার বসু

কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগরে ভিন্ন বাসা করাতে দাদা যথেষ্ট বিরক্ত হইলেন। এমন কি বিমুখ হইয়া থাকিতেন। আমার সঙ্গে কথা বলিতেন না। মধ্যে মধ্যে দুই বাটীর মধ্যের দ্বার রুদ্ধ করিবেন ভয় দেখাইতেন। আমি প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট আসিয়া বসিতাম—কথা বলুন আর নাই বলুন।

যুক্ত পরিবার আমাদের দেশে চিরকালই আছে। ইহাতে সুবিধার মধ্যে খরচ কম হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকগণ মধ্যে কখনই সদ্ভাব থাকে না, পরস্পর দ্বেষ থাকে, ও অনেক সময় কলহ হয়। পূর্ব্বে পুরুষগণ সকলে উপার্জ্জনক্ষম হইত না, কেহ কেহ উপার্জ্জন করিত, কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিত। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে আমার পিতা ও খুড়া রাসবিহারী বসু উপার্জ্জন করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে খুড়াই একমাত্র চাকরি করিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় গৃহে থাকিতেন, ও সামান্য যে বিষয় ছিল তাহাই তত্ত্বাবধান করিতেন। পিতার দুই খুড়তুত ভ্রাতার মধ্যে একজন সামান্য কেরাণীগিরি করিতেন, আর একজন কিছুই করিতেন না, কিন্তু শেষোক্ত খুড়ার অনেকগুলি সন্তান। রাসবিহারী খুড়া সংসারের খরচের সাহায্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের বিদেশে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষার খরচ সমস্তই দিতেন। তিনি

অর্থ না দিলে আমরা কেহই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতাম না ও উপার্জ্জনক্ষম হইতাম না। আমি তের বৎসরে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি। দাদা যখন প্রথম উপার্জ্জনক্ষম হয়েন, তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর। ১৭ বৎসর বয়সে ইংরাজী পড়া আরম্ভ করা কখনই হইত না। অতএব যুক্ত পরিবারের সুবিধা পাইয়াই আমি মানুষ হইয়াছিলাম। অবশ্য একান্নবর্ত্তী না হইয়াও পরস্পরকে সাহায্য করা যায়, কিন্তু তাহাতে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়। যাহাদের আয় অল্প তাহাদের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের দেশের রীত্যনুসারে, আহারের জন্য অল্পই খরচ হয়, ও বাসস্থানও যৎসামান্য হইলেই চলে। চার ভাইয়ের পরিবার একত্র থাকিলে যে খরচ হয়, ভিন্ন ভিন্ন হইলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ হয়, এ নিশ্চয়। এজন্য পূর্ব্বকালে অনেক পরিবার একত্র থাকিত। বাল্যকালে দেখিয়াছি মঙ্গলকোট ঘোষ মহাশয়দের গৃহে প্রায় ১০০ শত ব্যক্তি একান্নে বাস করিত। নিকটবর্ত্তী আর এক গ্রামে এক জমিদার বাঁড়ুয্যে বংশে ২০০ শত স্ত্রীপুরুষ এক অন্নে বাস করিত। ইহাদের আহারও যৎসামান্য, এক ডাল, এক চড়চড়ি ও মাছের ঝোল বা অম্বল। সকলেরই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, বেলা ১টা বা ২ টার সময় আহার হইত। ১২।১৪টী পরিবারের একত্র আহার প্রস্তুত করা কত অসুবিধা, তবে প্রত্যেক পরিবারের বিভিন্ন গৃহ ছিল, যাহার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে, কাহারও পাকা দোতলা

দালান, কাহারও সামান্য খড়ো ঘর। বস্ত্রাদিও বিভিন্নরূপে খরিদ হইত। কেবল আহারের কার্য্য একত্র হইত।

আদর্শ যুক্ত পরিবার বলিলে বুঝিতে হইবে যে সকলেরই একপ্রকার আহার, একপ্রকার পরিধান, গহনা, তৈজসপত্র সব একপ্রকার। সামান্য ইতর বিশেষ হইলেই পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ সৃজন হয়। যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করে, তাহার সন্তানগণ যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিবে তাহার ভ্রাতা ভগ্নীর সন্তানগণও সেইরূপ পরিবে, তাহার স্ত্রী যেরূপ অলঙ্কার পরিবে, তাহার ভ্রাতৃবধূ ও ভগ্নীগণ সেইরূপ অলঙ্কার পরিবে। কিন্তু কার্য্যে এরূপ সমতা রক্ষা কখনই হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ সহজেই উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণনগরে Municipality-র যে গৃহ ছিল, সেই গৃহে Road Cess office, District Board office ও Municipal office কোনরূপে সঙ্কুলান হইল। আমি District Board-এর মেম্বর ছিলাম। আমি প্রস্তাব করিলাম যে এই গৃহ District Board ক্রয় করিয়া লউক, আর Municipality সহরের ভিতর নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া লউক। সে সময়ে District Board-এর Vice-chairman ও Municipality-র Chairman কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা তিনি D B. office জজ্ কোর্টের নিকট কোন গৃহে লইয়া যান, তাহাতে তাঁহার সুবিধা হইবে, কারণ তিনি উকিল। আমি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে এ কখনই সম্ভব হইবে

না, কিন্তু তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার স্বপক্ষ হইয়া আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার ১৫ বৎসর পরে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইল। তখন অবশ্য আমি কৃষ্ণনগর ছিলাম না। লোকের মনে সদ্‌বুদ্ধি সহজে আসিতে চায় না, সময় সাপেক্ষ। স্বার্থে অন্ধ হইয়া লোকে উচিত, উপযুক্ত বা সম্ভবপর বিবেচনা করিতে পারে না।

সে সময়ে কৃষ্ণনগরে ২।৪ জন মুসলমান উকিল মোক্তার ছিলেন। একজন মুসলমান Deputy Magistrate ছিলেন। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, বাঙ্গালা সামান্য জানিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা ভিন্ন কিছুই করিতেন না বলিলেই হয়, কিন্তু তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরা সকল প্রকার কার্য্য যথাবিধি করিলে কি হয়, সাম্বৎসরিক মন্তব্য লিখিবার সময় মুসলমান ডেপুটীর প্রশংসা যথেষ্ট হইত। আমার এক একটা দোষ ধরিয়া দিতেন। কোনবার লিখিতেন "কিছু ধীর", কোনবার লিখিতেন "কিছু দ্রুত"। সেই অবধি বাৎসরিক মন্তব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই আর দেখি নাই। উহা অনর্থক ও বৃথা লেখকের মানসিক ভাব প্রকাশ করে মাত্র। Hopkyns সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন "Young Bengal walks by the very middle of the road." অর্থাৎ এখনকার বাঙ্গালী যুবকেরা পথের ঠিক মাঝখান দিয়া চলিবে, কাহাকেও পাশ দিবে না। বৃদ্ধ Deputy Magistrate-গণ খুব অবনত হইয়া দুই হাতে সেলাম করিতেন,

আমি তাহা করিতাম না, এই জন্যই আমার প্রতি কোপ। Hopkyns সাহেবের মেম কখনও বাঙ্গালীর সম্মুখে বাহির হইতেন না, সাহেব বাহিরের ঘরে কাহারও সঙ্গে থাকিবার সময় তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে, দরজায় আঘাত করিতেন। তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, শুনিতাম তিনি কেবল রাত্রে গৃহের বাহিরে আসিতেন, বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে নারাজ।

এখন কৃষ্ণনগরে একজনও উকিল, মোক্তার বা হাকিম মুসলমান নাই। এ জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও কৃতবিদ্য অল্পই, গভর্ণমেণ্ট মুসলমানগণকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। হিন্দুর মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ভিন্ন অন্যান্য জাতি অল্পই কৃতবিদ্য দেখা যায়। কৈবর্ত্ত, কর্ম্মকার, নাপিত প্রভৃতির মধ্যে ২।১ জন শিক্ষিত আছে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অনেক নিম্নজাতি আছে, যাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই। এ জেলার সাধারণ মুসলমান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে বিধর্ম্মী হইয়াছে, এ কথাটা কর্ত্তৃপক্ষরা অনেক সময় বিস্মৃত হন। মুসলমান হইলেই যে উচ্চবংশীয় হিন্দু কি মুসলমানের সমকক্ষ হইবে ইহা সম্ভব নহে। নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক খৃষ্টান হইয়াছে, তাহাদেরও একই অবস্থা, যদিও পাদ্রি মহাশয়গণ তাহাদিগের ধর্ম্মোপদেশ ভিন্ন সাংসারিক কার্য্যে উন্নতির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

বীরভূম, সিউড়ী

জানুয়ারী ১৮৮৮ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৮৯২

ডুবরাজপুরের পথে মাঠের মধ্যে রাজার বাংলোয় বাসা পাইয়াছিলাম। সহর হইতে কিছু দূর। কিন্তু পরিষ্কার স্থান। কুয়ার জল ভাল ছিল, কিন্তু এক বাঙ্গালী ডাক্তার সাহেব কুয়ার ধারে এক গর্ত্ত কাটিয়া মাটী তুলিয়াছিলেন, বর্ষায় সেই গর্ত্তে ময়লা জল জমিয়া কুয়ার ভিতর যাইত। সাবাস ডাক্তারি বিদ্যা!

বীরভূমে তখন দুইজন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিত, হয় দুইজনই Deputy Magistrate, না হয় একজন Civilian, Statutory or Indian। কাজেই অনেক কার্য্য করিতে হইত। এই চারি বৎসর সুখে কাটিয়াছিল, যদিও ইহার মধ্যে দুইবার remittent fever হয়। একবার বিনা চিকিৎসায় প্রায় তিন সপ্তাহ ভুগিয়াছিলাম। ডাক্তারির উপর অভক্তি, ও ডাক্তারি ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ ইহার কারণ। প্রখর জ্বর, দাহ, ও মধ্যে মধ্যে বিকার। ২০ দিন পরে শিখর আসিয়া দুই ফোঁটা Ipecac দিয়া জ্বর বিরাম করিয়া দিলেন।

দুই পুত্র বীরেন আর সত্যেন সেখানে জন্মে। শেষ দুই বৎসর Special Sub Registrar ছিলাম, তাহাতে বৎসরে ১০০০ টাকা আয় হইত।

বাসগৃহ বৃহৎ বাংলো, একটী প্রকাণ্ড ময়দানের মধ্যে অবস্থিত। বাটী ভাড়া ২০ টাকা নামে মাত্র। আমি ইচ্ছামত ভাড়ার টাকা খরচ করিতাম। হেতমপুরের রাজা মহাশয় কখনও ভাড়ার টাকা দাবী করিতেন না। গৃহ সংস্কার ইচ্ছামত করিতাম। ৪ বৎসর পরে আসিবার সময় বক্রী টাকা তাঁহার মোক্তারকে ডাকিয়া শোধ করিয়া দিলাম। একবার গৃহে চোর ঢুকিয়াছিল, ও সিঁধ দিয়াছিল, কিছু কিছু সামান্য দ্রব্যাদি অপহৃত হয়। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে এত ভয় হইয়াছিল যে কয়েক মাস সে জন্য নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। যতদূর আমার স্মরণ হয় সম্মুখে বিপদ দেখিয়া কখনও ভয় পাই নাই, কিন্তু অদৃষ্ট বিপদে মন আকুল করিত। সেই অবধি আমি অত্যন্ত সতর্ক থাকিতাম। তাহার ফলে আমি অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি। খুনী চোরের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি, সসর্প গৃহে, নির্জ্জন গৃহে, নির্জ্জন স্থানে, একা বা পরিবারসহ বাস করিয়াছি, কখনও বিপদ আমাকে বা আমার পরিবারবর্গ কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। রোগকেও আমি দূরে রাখিতে পারিয়াছি। মৃত্যু আমার গৃহে অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই, কোন সাংঘাতিক আয়ুক্ষয়কর রোগ বা অঙ্গহানিজনক কোন রোগ কখনও আমার গৃহে প্রবেশাধিকার পায় নাই। পুত্রদিগকে সাহসী ও কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যায়াম, অন্ধকারেও অসহায়ে ও নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়াছি। তাহারা সকলেই সবল ও সুস্থকায় হইয়াছে।

এ সমস্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশা করা মূর্খতা। এখানে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। গার্হস্থ্য জীবনে অনেক সমস্যা উপস্থিত হয়, এবং অনেক বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ লইয়া লোকে কাজ করিয়া থাকে। আমিও লোকের পরামর্শ খুঁজিয়া থাকি, ও পরে নিজের বিবেচনা মত কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে যে ব্যক্তি সংসার ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে নিজেকে ও অধীনস্থ সকলকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে, তাঁহারই নিকট গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ মিষ্টভাষী, গম্ভীর ও সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট পরামর্শ লইতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমার মত সামান্য লোকের পরামর্শ কেহ গ্রাহ্য করে না। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, কোন বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকিলেও আমি অগ্রাহ্য হই ও আমার অপেক্ষা অজ্ঞ লোকের বাক্য অধিক আদরের সহিত গৃহীত হয়।

বীরভূম স্থান আমার মনোরম বোধ হইয়াছিল, আর সেখানকার লোকগুলি বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী-দিগের অপেক্ষা সরলপ্রকৃতি ও মিষ্টভাষী। মিষ্টভাষী লোক বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি এমন সরল নহে। আমি অবশ্য অধিক সংখ্যক লোকের বিষয় বলিতেছি। সেখানে চারি বৎসরের মধ্যে কাহারও সহিত মনোমালিন্য হয় নাই।

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এই ব্যক্তি যখন হুগ্‌লি Civil Service Class এ পড়েন, তখন সুন্দর ও সরল প্রকৃতি যুবা বলিয়া আমার প্রিয় হন। বীরভূমে তিনি Income Tax Assessor & Excise Sub-Inspector ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান, তাঁহার স্ত্রী প্রতাপান্বিতা। চাকরিতে তিনি কিছু সঙ্গতি করিয়াছিলেন। পরে তিনি Distillery Superintendent হন। তিনি কার্য্য-দক্ষ লোক ছিলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; কিন্তু তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে অত্যন্ত দমনে রাখিতেন। একদিন কোন কার্য্যো-পলক্ষে তাঁহার গৃহের নিকটে গিয়াছি, শুনিলাম উমেশ জ্বরগ্রস্ত ও আমার সহিত দেখা করিতে চান। আমি গেলাম, তিনি তাঁহার গৃহিণীর অত্যাচারের কথা বলিতেছেন এমন সময় তাঁহার গৃহিণী দরজার বাহির হইতে বলিলেন "শুধু উঁহার কথা শুনিবেন না, আমার কথাও শুনুন, উঁহাকে আপনি চেনেন না, কেমন দুশ্চরিত্র লোক তাহা আপনি জানেন না। প্রতিমাসে মাহিনা ও ভাতা সমস্ত আমাকে না দিলে আমি এতবড় সংসার চালাই কিরূপে? উনি মধ্যে মধ্যে ভাতার টাকা হইতে চুরি করেন। গত মাসে ৬০৲ টাকা ভাতার মধ্যে উনি ৪০৲ টাকা দিয়াছেন। আর ২০৲ টাকা যে কি করিয়াছেন তাহা বলেন না।"

উমেশ বলিলেন 'আমি কয়েকদিন ব্যাধিগ্রস্ত ছিলাম, মফঃস্বলে যাই নাই।' তাঁহার স্ত্রী বলিলেন 'ও সব কথা কিছুই নহে, উনি

বরাবর ৬০৲ টাকা আমাকে দেন, কতবার ব্যারামে পড়িয়াছেন, কামাই করিয়াছেন, মফঃস্বলে মোটে যান নাই, আমি বরাবর ৬০৲ টাকা পাইয়াছি। আমি এখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাইব, আর নালিশ করিব। দেখি উনি টাকা দেন কি-না?' ইত্যাদি। অনেক আরাধনা করিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলাম। কিন্তু সেই অবধি স্ত্রীপুরুষে বিবাদ হইলে ঐ ঠাকুরাণী আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেন। উমেশ মধ্যে মধ্যে বেশ আঘাত প্রাপ্ত হইতেন ও বলিতেন তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র একত্র হইয়া প্রহার করিয়াছে। উমেশ কিছুদিন পরে অন্তিম রোগশয্যায় পড়িলেন। পূজার সময় বাটী যাইবেন, হাতে টাকা নাই। Savings Bank-এ তাঁহার প্রায় ৮০০০৲ টাকা ছিল, কিন্তু ঐ বহি সমস্ত গৃহিণীর হাতে, পাইবার উপায় নাই। ১৫০৲ টাকা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমার নিকট ধার প্রার্থনা করিলেন। বাটী হইতে জীবিত ফিরিয়া আসেন এ সম্ভাবনা অল্প, তথাপি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ধার দিতে হইল। বাটী হইতে আসিয়া ধার শোধ দিলেন, অল্পদিন পরে গৃহিণীর অত্যাচার হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইলেন।

আমার মনে হয় অনেক গৃহে এরূপ বা ইহার অধিক অত্যাচার সংঘটিত হইয়া থাকে। তবে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহ-কুৎসা সংগোপনে রাখাই রীতি। আমাদের দেশের মহিলাগণ যেরূপ অশিক্ষিতা তাহাতে দাম্পত্যজীবন যে সাধারণতঃ দুঃখময় হইবে ইহাই সম্ভব। তবে প্রথম বয়সে যুবকগণ বালিকা স্ত্রীর

গুণহীনতা সমস্তই নির্দ্দোষ মনে করে। এমন কি কেহ কেহ ঐ মূর্খতাই প্রশংসনীয় বোধ করে। এজন্য অনেকের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না থাকিলেও সংসার নিতান্ত অচল হয় না, পরে সন্তানাদি হইলে পরস্পর গুরুতর বন্ধনে পড়িলে পুরুষেরা সাবধান হইয়া চলে।

যে দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, সে দেশে বিবাদ হইলেই প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়ে, অথবা আদালত আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য আমাদের দেশের লোক মনে করে যে সে দেশের দাম্পত্যজীবনে সুখ নাই অর্থাৎ আমাদের দেশের পারিবারিক জীবন অধিক সুখকর। এ কথা নিশ্চয় যে এদেশে পারিবারিক জীবনে সুখ যৎসামান্য; কিন্তু স্ত্রীপুরুষে দিনের অধিক সময় অন্তরে থাকিবার জন্য বিবাদ কম হয়। বাঙ্গালী জাতি সাংঘাতিক বিবাদে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। কিন্তু স্ত্রী স্বাধীন জাতির সুখের সঙ্গে তাহাদেব অবস্থা তুলনার যোগ্যই নহে।

ম্যাজিষ্ট্রেট কক্সহেড

ইনি কিছুদিন বীরভূমে ছিলেন। লোকটী সরল প্রকৃতি ও সদয়; কিন্তু অসম্ভব অসহিষ্ণু। অতি সত্বর সামান্য কথায় ক্রুদ্ধ হন, আর ধৈর্য্যচ্যুত হইলেই চীৎকার করিতে থাকেন। যখন তিনি কাছারী বসিতেন তাঁহার চীৎকার অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা

যাইত। আমি বলিতাম British lion roaring। একদিন তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া দৈনিক বাজার দেখিতে গেলেন। Municipal বাজার, পরিষ্কার চালা ও বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তরকারির-দোকানগুলির মধ্যখানে দেখা গেল যে একজন গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত লোক বসিয়া আছে। দেখিয়াই আর রক্ষা নাই। তোমরা হিন্দুগণ বাহিরে বেশ পরিষ্কার দেখাও, এই দেখ তোমরা কি আহার কর। এই বলিয়া ইংরাজিতে তাবস্বরে আমার প্রতি যে বক্তৃতা হইতে লাগিল, বাজারের লোক চাবিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহারা ভাবিল সাহেব আমাকে মারিয়া ফেলিবে। আমি উত্তর কি দিব, লজ্জায় চুপ্ কবিয়া থাকিলাম। এক কনষ্টেবলেব উপর হুকুম হইল, কুষ্ঠগ্রস্তকে তখনই হাঁসপাতালে লইয়া গেল, সাহেব নিজে সেখানে গিয়া Compounderকে ৪৲ টাকা দিলেন, ইহাদ্বাবা কুষ্ঠরোগীকে শুশ্রূষা করিতে হইবে। কুষ্ঠ শুশ্রূষার বন্দোবস্ত হাঁসপাতালে কিছুই নাই ; যাহা হউক টাকাগুলি Compounder-এর লাভ।

আমি অন্যান্য বাজারেও দেখিয়াছি কুষ্ঠগ্রস্ত লোক অবাধে বাজারে যায়। এমন কি তৈজসাদি বিক্রয় করে, কেহ বিশেষ আপত্তি করে না। কৃষ্ণনগর Municipal বাজারে আমি কয়েকবার Chairmanকে এ বিষয় জানাইয়াছি। কিন্তু সাধারণ লোক যখন এ বিষয়ে আস্থাহীন তখন অধিকৃতেরা কি করিতে পারেন। সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে লোকের শিক্ষার অভাবই এ দেশের প্রধান দুর্দ্দশা। গৃহের চতুঃপার্শ্বে দুর্গন্ধ ময়লা জমাইয়া

রাখা, রাস্তাঘাট সমস্ত অপরিচ্ছন্ন, জলনালী সকল কৃষ্ণবর্ণ পূতি-তরল-পদার্থ পূর্ণ দেখিয়াও লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাভাবও নহে, লোকাভাবও নহে, শিক্ষার অভাব। Municipality তাহার কর্ত্তব্য অবহেলা করে, মেথর আসে নাই, অর্থ নাই, এ সকল কেবল আলস্যের ও তাচ্ছিল্যের উক্তি, যখন এই সকল তাচ্ছিল্য পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে, যখন এই পাপ হিন্দু মুসলমানের শত শত কৃত্রিম পাপ হইতে অধিক দূষ্য ও নিরয়কারী বলিয়া পরিগণিত হইবে তখন এদেশে সত্যকাল ফিরিয়া আসিবে। কৃত্রিম পাপ কাহাকে বলে পাঠক জান কি? শরীরে অশুচি স্পর্শ, অকালে ভোজন, বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বা অশাস্ত্রীয় বা নাপাক দ্রব্য আহার, ঠাকুরপূজা অবহেলা ইত্যাদি অসংখ্য কৃত্রিম পাপ আমাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

ইনি Statutory Civilian, Premchand Raychand Scholar।

যখন Presidency College-এ পড়িতেন তখন তাঁহার সহিত হিন্দু হোষ্টেলে একত্র বাস করিতাম। সেখানে তাঁহার

একবার উৎকট রোগ হয়, সেই অবধি তাঁহার সহিত আলাপ। বীরভূমে তিনি Joint Magistrate হইয়া আসেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, সরকারি কার্য্য প্রাণপণে করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল। বেদাদি সংস্কৃত শাস্ত্র তিনি সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। এই শাস্ত্রাভ্যাসে তিনি রাত্রে নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বেদ বিষয়ে সন্দর্ভ লিখিতেন ও বেদের অনুবাদ লইয়া আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথমে আপোষে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। সে বাদানুবাদের কথা প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহার অভিমতগুলি বিশেষ সারগ্রাহী। বেদের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ঋগ্‌-বেদের অনেক অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বলিতেন ঋগ্‌বেদ কৃষকের অর্থহীন গান বা অশিক্ষিত লোকেব অজ্ঞ বাচালতা বলিয়া যে অনেকের বিশ্বাস ইহার প্রধান কারণ ইহাব উপযুক্ত টীকা নাই ও কেহ ইহার সঠিক অর্থ করিতে পারে নাই। সায়নাচার্য্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে এখন মণ্ডল, শাখা, সূক্ত ও ঋক্‌ যেরূপ পর পর সাজান আছে তাহাই ভ্রমপূর্ণ।' যদি কেহ সমস্ত ঋগ্বেদ সম্পূর্ণ হৃদয়স্থ করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই পারম্পর্য্য ভাঙ্গিয়া সূক্ত ও ঋক্‌গুলি আবাব উপযুক্তমত গ্রথিত করিতে পারিবে। তখন অর্থ সুগম হইবে। আর, বেদে অনেক কথা রূপক তাহাব শব্দার্থ গ্রহণ করিলে কিছুই ভাব গ্রহণ হয় না। যেমন বামদেব ঋষির মাতৃগর্ভে

শাস্ত্রাভ্যাস ও মাতৃকুক্ষী ভেদ করিয়া প্রসব। সায়নাচার্য্য কেবলই শব্দার্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ভাবার্থ লিখিবার শক্তি অদ্যাপি কাহারও হয় নাই। উমেশবাবু সেই ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিতেন। দুই একটী সূক্ত অনুবাদ করিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

তিনি ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু সে ঈশ্বর উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নহেন। বেদান্তের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল না। সর্ব্বময় ঈশ্বর বা Pantheistic God বেদের প্রতিপাদ্য নহে, উহা উত্তর কালের বেদানভিজ্ঞ ঋষিদের শাস্ত্র। বেদের ঋষিগণ সন্ন্যাসী বা যোগী ছিলেন না, তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন। এখন পৃথিবীতে যে সকল জাতি বিভিন্ন দেশ ও লোক জয় করিয়া নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নশালী, তাহাদের ন্যায় সেকালের আর্য্যেরা ঈশ্বরের নিকট গোধন ও সম্পত্তি প্রাপ্তি, শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্তি ও দস্যু অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিদিগের বল খর্ব্ব করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্‌বেদে বিভিন্ন দেবতার নাম আছে বটে, সেগুলি কেবল ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম মাত্র, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা মহিমা প্রকাশক নাম। তাই বলিয়া বৈদান্তিকগণ যে ঐ সকল নামের মূল অর্থ অনুসন্ধান করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করেন সেরূপ অর্থ উমেশ বাবুর মনোনীত নহে। বৈদান্তিক অগ্নি শব্দ গম্

ধাতু হইতে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি অর্থে চিরস্থায়ী বা শাশ্বৎ, ইন্দ্র শব্দ ইদ্ ধাতু হইতে কিরণময় প্রভৃতি অর্থের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার বৈদিক ঈশ্বর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের Personal God।

এক কৃপণ

ইনিও Premchand Raychand Scholar ও Statutory Civilian। ইঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, এখানে প্রয়োজনও নাই। তিনি পূর্ব্বে শিক্ষা বিভাগে চাকরি করিতেন, পরে Civilian হন। যখন বীরভূমে যান তখন Joint Magistrate। তাঁহাকে দেখিলেই রুগ্ন বলিয়া বোধ হইত, শীর্ণকায় ও দুর্ব্বল। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, এক স্ত্রী ও এক শ্যালী মাত্র তাঁহার গৃহে ছিলেন। আর কেহই নহে, যতদূর মনে হয় ভৃত্যাদিও ছিল না, আর্দালি (orderly) তাঁহার কাজ করিত। গৃহে তৈজসপত্র কিছুই বোধ হয় ছিল না, আমি উপস্থিত হইলে একটী বৃহৎ সতরঞ্চ বিছান হইত। আমার সঙ্গে ক্রমে আলাপ হইল; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া অসম্ভব। অল্পদিন মধ্যে বুঝিলাম তাঁহার প্রায় প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হইত। কিন্তু চিকিৎসার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগী নহেন। জ্বর কিছু অধিক হইলে তিনি আমাদের অনুরোধে Civil Surgeon-কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই **Civil Surgeon** একটী গণ্ডমূর্খ, কোন দেশীয় রাজার আত্মীয়, বিলাতে গিয়া কিরূপে **Civil Surgeon** হইয়া বীরভূমে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। তিনি **Prescription** লিখিতে পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ। একদিন এক বিষ খাওয়া মোকদ্দমায় আমাব নিকট সাক্ষ্য দিতে প্রকাশ পাইল যে তিনি ডাক্তারি শাস্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ **Medical Jurisprudence** কাহাকে বলে তাহাই জানেন না, ও সে বিষয়ে কোন গ্রন্থ তাঁহাব জানা নাই। **Jt. Magistrate** তলব করিয়াছেন তিনি আসিলেন; কিন্তু চিকিৎসাব জন্য হাসপাতালের **Native Doctor**-কে সঙ্গে করিয়া আসিলেন। **Prescription** লেখা হইল; কিন্তু নেটিভ ডাক্তাবেব গাড়ী ভাড়া দিতে হইবে। কৃপণ ৷৷৹ আনা দিতে অসম্মত; শেষে দিতে হইল। আব ডাক্তাব ডাকাও বন্ধ হইল। ঔষধের মূল্য দিতে হয় সেও এক প্রধান আপত্তি। আরও ত ডাক্তার আছে, কিন্তু প্রাপ্য ফি না পাইলে কেহ চিকিৎসা কবিতে চাহে না। শেষে শুনিলেন যে আমার নিকট **Homœopathy** ঔষধের বাক্স আছে। সেজন্য আমাকে ঔষধ দিতে বলিলেন। আমি উত্তর করিলাম আমি ত চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। আমি আপনাকে চিকিৎসা কবিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দার ভাজন হইব। **Homœopathy** চিকিৎসা যদি ভাল মনে করেন তাহা হইলে একজন ডাক্তার বীরভূমে আছেন। তাহা অভিমত হইল না।

ডাক্তার বলিয়াছিল মাংস খাওয়া উচিত। বীরভূমে মাংসের দোকান নাই, পাঁঠা কিনিলে মাংস পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে ত কোন কাজের কথাই নহে। সেখানকার মোক্তারগণের এক কালীবাড়ী ছিল, সেখানে প্রতি শনিবারে পাঁঠা বলি হইত। সেই পাড়াতেই কৃপণের বাস। তাঁহার অনুরোধে মোক্তারগণ পাঁঠার মাথাটী তাঁহাকে দিত। সপ্তাহে এই মাথাদ্বারা তাঁহার মাংসাহার চলিত। একদিন বলিলেন যে তাঁহার কানের গোড়ায় ব্যথা হইয়াছে। ব্যথা সামান্য। শুনিয়া আমার ভয় হইল, গ্রীষ্মকাল, এরূপ ব্যথা সুস্থ ব্যক্তির হইবার সম্ভাবনা নহে। তিনি বলিলেন রাত্রে বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগিয়া থাকিবে, খড়খড়ি হয়ত খোলা ছিল, ঠাণ্ডায় ব্যথা হইয়াছে। আমি বলিলাম তাহা হইতে পারে, তবে আজ রাত্রে গলায় একটা কম্ফর্টার জড়াইয়া রাখিবেন। কাল সকালে কেমন থাকেন দেখুন। কিন্তু কর্ণমূলের ব্যথা ভয়ের কারণ, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। পরদিন বলিলেন ব্যথা বৃদ্ধি হইয়াছে, জ্বরও হইয়াছে। আমার মতে অবিলম্বে চিকিৎসা আবশ্যক। এখানকার চিকিৎসার প্রতি ভক্তি না থাকে কলিকাতায় যান, অথবা অন্যস্থান হইতে চিকিৎসক আনান। তিনি বলিলেন "কলিকাতায় যাইয়া কোথায় থাকি, আমাদের দেশের এক মহাজনের গদি বড়বাজারে আছে, সে আমাদের শিষ্য, সে যদি একটী থাকিবার ঘর দেয়।" আমি তাঁহার হইয়া কলিকাতাবাসী তাঁহার দুই বন্ধু ডাক্তারকে চিঠি লিখিলাম

তাঁহারা আসিয়া যেন চিকিৎসা করেন। এই প্রার্থনাক্রমে ডাক্তার বাবুরা উত্তর দিলেন যে তাঁহারা কার্য্যগতিকে যাইতে পারেন না, রোগী কলিকাতায় আসিলে যথাসাধ্য করিবেন। উপরোক্ত মহাজন একটী ঘর দিতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল, ব্যথা বৃদ্ধি হইল। তখন কলিকাতায় যাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে কে যায়! যাইবার আসিবার খরচ তিনি কাকেও দিতে নারাজ। শেষে অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে রোগী পাল্কিতে সাঁইথিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবেন, যুবতী দুইজন গাড়ীতে যাইবেন। ট্রেনের সময় রাত্রি ৪টা কি ৫টা। একজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল। রোগী রাত্রি ১২টার পর পাল্কিতে উঠিবেন, গাড়ী রাত্রি ২টার সময় রওনা হইবে। সন্ধ্যার সময় ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাসায় গেলাম, আমার বাসা সেখান হইতে অর্দ্ধ মাইলের অধিক।

পাঠক বলিবেন ইহাতে আমার সমূহ ক্রটী হইয়াছে, কেন আমি নিজ খরচে একজন উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিলাম না। পাল্কির সঙ্গে কেহই হাঁটিতে স্বীকার হয় নাই, অবশ্য খরচ দিলে একখানা গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে যাইত, রোগী সেরূপ সাহায্য লইতে অসম্মত। সে অসম্মতি আমার গ্রাহ্য করা উচিত ছিল না। কিন্তু লোকটার রীতিনীতিতে সকলেরই অভক্তি হইয়াছিল, বোধহয় এজন্য ততদূর করি নাই। যাহা হউক আমি নাজিরের উপর ভার দিয়া আসিলাম। নাজিরের গৃহ নিকটে, তিনি রাত্রে আসিয়া সকলকে রওনা করিয়া দিবেন।

পরে জানিলাম পাল্কিবেহারা সাঁইথিয়া পৌঁছিয়া রোগীকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়াছে। ঘোড়াগাড়ী সময়মত পৌঁছে নাই। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় হাওড়া পৌঁছেন। সেখানে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিয়া সাহায্য করিয়াছিল। তাহার ৮।১০ দিন পরে সংবাদ আসিল রোগী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

কৃতবিদ্য যুবাপুরুষ এমন কৃপণ অতি বিরল। তাঁহার সন্তানাদি নাই, ২০।২২ হাজার টাকা সে সময় তাঁহার সংস্থান হইয়াছে। ৫০০৲ টাকার অধিক মাহিনা পাইতেন। এত সঞ্চয় করিবার স্পৃহা কেন হয় এ বুদ্ধির অগম্য। লোকে অর্থপ্রিয় অনেকে হয় কিন্তু প্রিয়তা গৌণ অর্থাৎ ধন থাকিলে ভবিষ্যতে উপকারে আসিবে এই অভিপ্রায়ে সঞ্চয়, কেবল ধন বৃদ্ধির জন্য নহে। নিজের বা আত্মীয়ের উপকারার্থে সঞ্চয়কে মুখ্য ধনস্পৃহা বলা যায় না, সে গৌণ স্পৃহা। কিন্তু কেবল ধনের জন্যই ধন সঞ্চয় সেই মুখ্য ধনস্পৃহা। ইহা এক প্রকার ব্যাধি। যেমন মত্ততা এক ব্যাধি, চৌর্য্য অভ্যাস ব্যাধি, এ স্পৃহা সেই প্রকার ব্যাধি বলিতে হইবে।

একজন পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত সবজজ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া ও ৫০০৲ টাকা মাসিক পেন্‌সন্‌ পাইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর লয়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের কলেরা হইয়াছিল, রোগ সারিয়া উঠিয়াছে, ডাক্তার বার্লি পথ্য দিতে অনুমতি দেয়। বার্লি খরিদ করিতে ৷৷০ আনা লাগিবে। কৃপণ আজ্ঞা দিলেন একটু ফেন খাইলেই বার্লির কাজ হইবে। ফেন খাইয়া রোগ

আবার প্রকাশ হইল, ডাক্তার আসিয়া Prescription করিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ঔষধের মূল্য কত দিতে হইবে, ডাক্তার বলিল বোধহয় ॥০ আনা হইবে। বাবু বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন "টাকা ভাঙ্গাইয়া আন।" ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল তাহাতে বিলম্ব হইবে। এখনি ঔষধ চাই, ভৃত্য ডাক্তারখানায় গেলেই বাঁকি পয়সা পাইবে। বাবু তাহাতে নারাজ, ভৃত্য অর্দ্ধঘণ্টা পরে পয়সা আনিল। বাবু ॥০ আনা গণিয়া বাক্সে তুলিলেন, বাঁকি ॥০ আনা ভৃত্যকে ঔষধ আনিতে দিলেন। ঔষধ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পুত্র জীবনযাত্রা শেষ করিল। এরূপ কাণ্ড মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ইহাকে ব্যাধি ভিন্ন কি বলা যাইবে? পুরাতন সবজজদিগের এরূপ রীতি বিরল নহে। তখন গ্রাম্য মুন্‌সফি চৌকিতে ৫।৬ বৎসর কার্য্য করিয়া অনেকের খরচ প্রবৃত্তি একেবারে কমিয়া যাইত। সেই অভ্যাস আর যাইবার নহে। ১০০০৲ টাকা মাহিনা হইলেও কেহ কেহ মাসে ২০৲।৩০৲ টাকার মধ্যে সংসার খরচ চালাইতেন। তাঁহাদের যে কি শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহা দেখিলে দুঃখ হইত।

ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবজজ কতগুলি দেখিয়াছি যাঁহারা উপরিস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেবকে উপঢৌকন দিতে যথেষ্ট খরচ করিতেন, কিন্তু নিজ সন্তানদিগকে কুৎসিত আহারে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন। সেও কি ব্যাধি?

মাংসাহারে লোভ

একজন বণিক এক নালিশ উপস্থিত করিল যে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাহার ছাগল চুরি করিয়াছে। ব্রাহ্মণীর বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন আর কেহ নাই। পিতা শাস্ত্রজ্ঞ ও শিষ্য সেবকের যজমানী করিয়া জীবনধারণ করেন। ব্রাহ্মণী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা স্থূলকায়, বীরাঙ্গনা নামের উপযুক্ত পাত্রী। গৃহাঙ্গন মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত। প্রমাণ হইল যে ব্রাহ্মণী ক্ষুদ্র ছাগ শিশু গৃহের নিকটে আসিলে পিতার অজ্ঞাতে তাহাকে ধরিয়া নিয়া প্রাচীর দ্বার বন্ধ করিয়া বটী দিয়া তাহাকে তরকারীতে পরিণত করেন। তাঁহার রান্নার হাঁড়ীতে মাংস পাওয়া গেল। প্রতিবেশীরা তাঁহার কাণ্ড মধ্যে মধ্যে দেখিয়াও প্রকাশ করে নাই। এরূপ অপরাধ প্রকাশ হইলে সমাজ কঠোর সাজা দিয়া থাকে, আদালতের সাজা যৎকিঞ্চিৎ।

একটী খঞ্জ ব্রাহ্মণীর কথা মনে হইতেছে। তাঁহার বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে, সুরূপা, কিন্তু এক পা-খঞ্জ। তাঁহার আখ্যান সরলতাপূর্ণ ও করুণা বিজড়িত। তাঁহার স্বামীও সুপুরুষ। গৃহে স্বামী ভিন্ন কেবল শ্বশুর আছেন। তাঁহার নালিশ এই যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে যাতনা দেয়, প্রহার করে, আর খাইতে দেয় না। তিনি স্বতন্ত্র হইয়া খোরপোষ চান। তাঁহার পতি ও শ্বশুর সাধারণ ভদ্রলোক, হাবভাবে নিষ্ঠুর বা নৃশংস বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন একদিন বিনা

অপরাধে স্বামী তাঁহাকে কঠিন প্রহার করে। তিনি গাত্র বেদনায় ও মনোদুঃখে সেই রান্নাঘরের এক পার্শ্বে তিনদিন পড়িয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই। পরে তিনি গৃহের বাহির হইয়া আত্মীয়দের সাহায্যে এই মোকদ্দমা করিতেছেন। তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর আদালতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা বাদিনীব আখ্যান কিছুমাত্র অস্বীকার করিলেন না, তাঁহারা বলেন বাদিনী অত্যন্ত রাগী ও কলহপ্রিয়া, বৃদ্ধ শ্বশুরকে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দেয় ও সর্ব্বদাই কোঁদল ও গালি-বর্ষণ তাহার কাজ। নগদ টাকা দ্বারা তাহাকে পোষণ করিতে তাঁহারা অক্ষম। আশ্চর্য্য এমন কলকণ্ঠ, করুণা মিশ্রিত ভাব থাকাতেও নারী এমন কলহপ্রিয়া হইতে পারে। যাহা হউক দুঃখের বিষয় এই যে তিনদিন পিতাপুত্র নিজেরা রাঁধিয়া দুবেলা আহার করিয়াছেন, আর যুবতী মহিলা অনাহারে মৃতপ্রায় সম্মুখে পড়িয়া আছে তাহাকে ডাকে নাই। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, আপনার মুখে অন্ন উঠিত কিরূপে? দুঃখ হইত না?" বৃদ্ধ কোন উত্তর করিল না, যাহা হউক দুই পক্ষকে বুঝাইয়া মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া গেল। স্ত্রীলোকটী অনেক কাঁদিল, শেষে স্বামী শান্তিভঙ্গের মুচলিকা লিখিয়া দিলে তাহার গৃহে যাইতে সম্মতা হইল।

বনগ্রাম (১৮৯২-৯৩)

১৮৯২ সালে জানুয়ারী মাসে আমার বনগ্রামে বদ্‌লি গেজেট হইল। বদ্‌লি রহিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কটন সাহেব সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পত্র তাঁহাকে দিলাম। কিছুই ফল হইল না।

চাকর সঙ্গে কেহ গেল না। পরিবার কলিকাতায় কালীচরণ বাবুর বাড়ীতে রাখিলাম। শিখর সে সময় কলিকাতায় ডাক্তারি করিতেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী একা বনগ্রামে পৌঁছিলাম। জ্ঞানদা দাদা সেখানে Sub-Registrar। সরকারি গৃহ অত্যন্ত ময়লা, শূকর থাকিবার উপযুক্ত। এক কলিকাতার বাবু যিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন, এবং যাঁহার স্থানে আমি যাই, তিনি গৃহের এই দশা করিয়াছেন। ঘরের ভিতর রশুই করিয়া সমস্ত দেয়াল ও ছাদ বিবর্ণ, বড় বড় দরজাগুলি, তাহাতে হাত লাগিলে চট্ চট্ করে, সব তেল কালি মাখা, মেজে অনেক স্থানে ভাঙ্গা ও ময়লা কাদাময়। সারি সারি পিপীলিকার দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বারাণ্ডা সমস্ত চাটাই দিয়া ঘেরা, তাহা ঝুলময়। মনে অত্যন্ত অসুখ হইল। কালেক্টর সাহেবকে লিখিলাম। তিনি পরিষ্কার করিতে ও চুন ফিরাইবার জন্য ৫০৲ মঞ্জুর করিলেন। মঞ্জুর করিলে কি হয়, District Engineer বলিলেন তিনি ঐ টাকায় কার্য্য সমাধা করিবেন।

ততদিন পরিবার পরের বাড়ী কিরূপে রাখি, অগত্যা ধুইয়া মুছিয়া যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া ৩।৪ দিন পরে পরিবার আনিলাম। এদিকে touring সময় মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইতে হইত। ফেব্রুয়ারী ২৫শে মাতাঠাকুরাণী মাগুরা হইতে যশোহর হইয়া কলিকাতায় শিখরের নিকট যাইতে বনগ্রাম নামিলেন। সঙ্গে একটী বালক মাত্র, আমার ভাগিনা। তিনি একদিন মাত্র ছিলেন। পরদিন কলিকাতায় গেলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫টার সময় টেলিগ্রাম আসিল তিনি রুগ্না ও মৃতকল্পা। আমি যাইয়া দেখি তাঁহার দাহ হইয়া গিয়াছে। সকালে কলেরা প্রকাশ পায়। শিখর তাঁহাকে বেশী করিয়া আফিম খাইতে বলে। যখন স্পষ্ট কলেরা প্রকাশ হইল তখন শিখর সপরিবারে পলাইয়া এক আত্মীয় গৃহে আশ্রয় লইল। দাদাকে তখনই টেলিগ্রাম করে ও আমাকে ৫টার সময় করে। মা ও তাঁহার সঙ্গী দৌহিত্রের এক সঙ্গে কলেরা হয়। আমি ২৮শে দুইপ্রহরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনি সত্যেন তখন ১বৎসরের খোকা, তাহারও কলেরা হইয়াছে।

নিতান্ত ময়লা গৃহে বাসের জন্য এই সব দুর্ঘটনা হইয়াছিল।

কলিকাতার বাবুরা প্রায়ই অতি অপরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর থুথু ফেলিবে। ছেলেমেয়েরা মলমূত্র ত্যাগ করিলে মল ফেলিয়া দেয় মাত্র, স্থান সমস্ত পড়িয়া থাকে, ঘর ধুইয়া ফেলে না। শোবার ঘরে রাঁধিতে ও ভোজন করিতে দ্বিধা নাই। ভোজনের স্থানও অপরিষ্কার রাখে। কলিকাতার

লোকে একথা শুনিলে অবশ্য বলিবেন মিথ্যা কথা। কারণ বাবুরা নিজেরা কখনও এবিষয় প্রণিধান করেন না, খোঁজ অল্পই লয়েন।

বাঙ্গালীর পুরুষানুক্রমে শত শত বৎসর মেটে ঘরে থাকা অভ্যাস। মেটে ঘর গোবর মাটী লেপিলেই পরিষ্কার হয়, পাকা মেঝে যে না ধুইলে পরিষ্কার হয় না ইহা শিখিতে বাঙ্গালীর অনেক পুরুষ লাগিবে। কলিকাতায় বাস কেবল ২০০ বৎসরের বেশী নহে।

মাতার শ্রাদ্ধ মহাধুমধামে কৃষ্ণনগরে সম্পন্ন হয়, প্রায় ৪০০০৲ টাকা খরচ হয়। আমি ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলাম, আর ৫০০৲ ঐ উপলক্ষে ভগ্নীর গৃহ প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধে অত অর্থ খরচ করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। দাদা কৃষ্ণনগরে উকিল, তাঁহার সামাজিক কার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন হইল। তাঁহার পক্ষে ৪০০০৲ টাকা অকিঞ্চিৎকর।

শ্রাদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে ইহার প্রধান অঙ্গ প্রেতাত্মাকে আহার প্রদান। এটী পুরাকালের জঘন্য কুসংস্কার।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণের বিশ্বাস যে পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে যথাসাধ্য খরচ করা আবশ্যক, ইহাতে ঋণগ্রস্ত হইলে দোষ নাই। এ দেশের অনেক পরিবার শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও ঋণে জড়িত হইয়া একেবারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা আমি স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি। পুরোহিত, আত্মীয় বন্ধু সকলেই অধিক খরচ করিতে উৎসাহ দিতে থাকে। যাহাদের

পিতামাতার প্রতি বিশেষ ভক্তি, তাহাদের হৃদয় সে সময় শোকে দুর্ব্বল হয়, আর প্রোৎসাহে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। বিশেষ সাধারণ লোক প্রায়ই আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে উন্মুখ, তাহাদিগকে সেই ঘটনা উপলক্ষে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রোৎসাহিত করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

বর্দ্ধমান

(জুলাই ১৮৯৩ হইতে আগষ্ট ১৮৯৫)

বর্দ্ধমানে আবাসগৃহ স্থির হইবার পূর্ব্বে বনগ্রাম ত্যাগ করিতে হইল। কলিকাতায় বাসা করিয়া পরিবার রাখিতে চেষ্টা করিলাম। উপযুক্ত গৃহ পাওয়া যায় না। শিখরের ক্ষুদ্র গৃহ, তিনিও নিমন্ত্রণ করিলেন না। ২।৪ দিন কালীচরণ বাবুর গৃহে থাকিয়া একটা বাসায় পরিবার রাখিয়া বর্দ্ধমানে গেলাম, সেখানেও বাড়ী পাওয়া যায় না। একটা অফিসে একা থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। এদিকে কলিকাতায় সন্তানগণ সকলেই পীড়িত। শ্বশুরশাশুড়ী ও তাঁহাদের কোন কোন সন্তানও ছিল, তাঁহারা আমার শিশু সন্তানগণকে ফেলিয়াও যাইতে পারেন না। তাঁহাদেরও জ্বর। কলিকাতায় ৫০৲ টাকা ভাড়ায় একটী গৃহে সকলকে রাখিলাম। কিন্তু সকলেই

পীড়িত, ভৃত্য পর্য্যন্ত। শিখরের বাসা নিকটে ছিল; কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শ্রীযুত রতিদাদা তখন কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি যত্ন করিতেন।

গৃহহীনতার যে কি দুঃখ তাহা এই প্রথম অনুভব করিলাম। এতদিন গৃহেব চেষ্টা কবি নাই, ভাবিতাম আবশ্যক হইলে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিব। এখন দেখিলাম সে বৃথা আশা। একমাস পরে বৰ্দ্ধমানে একটী গৃহ পাইলাম। সেখানে পরিবার আনিলাম।

বৰ্দ্ধমানে আমার কাশির ব্যারাম হয়, Civil Surgeon বলিলেন Bronchial asthma এবং Dyspepsia due to malaria.

রমেশচন্দ্র দত্ত, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

দত্ত সাহেব পণ্ডিত লোক, ইংরাজি বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত। আমাদের ভক্তির পাত্র, কিন্তু কাজ সম্বন্ধে কঠোব শাসন। তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু আইন বিষয়ে বিজ্ঞতা গভীর ছিল না। জমি সম্বন্ধে বিবাদ হইলেই তাঁহার বিবেচনায় Deputy Magistrate বিবাদ মীমাংসা করিতে বাধ্য। দণ্ডবিধি অনুসারে সাজার অযোগ্য বলিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। কোন এক পক্ষকে সাজা দিতে হইবে

অথবা ভূমির দখল সাব্যস্ত করিতে হইবে। এই বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে মতান্তর হইত।

একজন কেরাণী কোনও I'y. Magistrate-এর সাক্ষীর হাজিরা বহি মিথ্যা লিখিয়াছে বলিয়া ৬ মাস কার্য্য হইতে অপসৃত হয় ও সাহেবের এক বন্ধুর অনুরোধ-পত্র আনিয়াছিল বলিয়া একেবারে অপসৃত হয়। এই বিষয় যখন আমাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন তখন আমি দেখাইলাম যে High Court-এব অনুজ্ঞানুসারে বেলা ১২টার পরে সাক্ষী উপস্থিত হইলে বিনা দরখাস্তে হাজিরা লেখার নিয়ম নাই। বিজ্ঞাপন তিরোহিত হইল। আমার আর্দালি আমাব মাহিনা ট্রেজারী হইতে আনিবার সময় একটী টাকা চুরি করে। চুরির স্পষ্ট কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তাহার ব্যবহারে আমার বিশ্বাস হয় যে সে চুরি করিয়াছে। আমি তাহাকে দূরীভূত করিলাম। দত্ত সাহেব তাহাকে তাড়াইবেন না। অথবা তাহাকে অন্যত্র দিয়া অন্য কোন লোক আমাকে দিবেন না। আমিও তাহাকে নিকটে আসিতে দিই না। ফর্দ্দ কাগজ লেখালেখি চলিল। পরে নিজে যাইয়া বলিলে তাহাকে অন্যত্র দিলেন। কিছুদিন পরে সেখানেও চুরি করিয়া দূরীভূত হয়।

দত্ত সাহেব পরে কমিশনার হন। সেই সময় এক গাঁটকাটাকে অল্প সাজা দিয়াছিলাম বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আমার নামে অনুযোগ করেন। গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় জজ ব্রজেন্দ্রশীল আমার মোকদ্দমার নথি সকল দেখিয়া রিপোর্ট করেন। দত্ত সাহেবের

অভিপ্রায় যে আমার সরাসরি বিচারের ক্ষমতা উঠিয়া যায়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেন না।

আমি ১৫ বৎসর অবসর লই নাই। Civil Surgeon-এর অনুরোধ-পত্র সহ অবসরের আবেদন করিলেও গভর্ণমেণ্ট অবসর মঞ্জুর করেন নাই। দত্ত সাহেব কিন্তু আমার সপক্ষে কয়েকবার লিখিয়া দিলেন।

দত্ত সাহেব অতি সদাশয় ও মহাত্মা লোক ছিলেন। রাগের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করিতেন না।

তিনি সরকারি কার্য্যে বিশেষ ফৌজদারী মোকদ্দমায় অনেক ভুল করিতেন। সে সব পণ্ডিতলোকেরা প্রায়ই করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের জীবনচরিতে দুই একটা মোকদ্দমার কথা থাকিলে অপ্রিয় হয় না, দুই একটী উল্লেখ যোগ্য মোকদ্দমা মনে হইতেছে।

একটী গোপবালিকা

বালিকাটির নাম রাধা, অবশ্য বৃন্দাবনের শ্রীরাধা নহেন। এই বালিকাটি রামপুরহাটের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত ও বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী বলিয়া পরিগণিত ছিল, ও অনেক পারিতোষিক ও বৃত্তি পাইয়াছে। সেখানে তাহার মাসীর গৃহে পালিত হয়। মাসীর চরিত্র আদর্শযোগ্য ছিল না।

বালিকার বয়স ১৩।১৪ বৎসর, শ্যামবর্ণা ও সুরূপা, তবে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। বীরভূমের নিকট কোন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর সামান্য চাষী, স্বামীও তাই, লেখাপড়া জানে না, কৃষিকার্য্যই ব্যবসা। ১০ বৎসর বয়সে কন্যাটীর বিবাহ হয়। ১৩।১৪ বৎসব বয়সে স্বামীগৃহে আসে। এতদিন নানা কারণে আসে নাই। তাহার মাসী আসিতে দেয় নাই। শ্বশুরগৃহে আসিলে তাহার শাশুড়ী পুত্রবধূর হাবভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কৃষকগৃহের ধানভানা, ভাতরাঁধা ও অপরিচ্ছন্নতা বালিকার অত্যন্ত অরুচিকর, সে মাসী গৃহে যাইতে চাহে। শ্বশ্রু ও রকম সকম দেখিয়া তাহাকে বিদায় দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু শ্বশুরের তাহাতে অমত। শাশুড়ী নিজপুত্রের আহারাদি নিজহস্তে দিত। পুত্রবধূকে বিশ্বাস করিত না। একদিন বিকালে শাশুড়ী ঢেঁকি ঘরে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে দুইপুত্র ক্ষেত হইতে গৃহে আসিয়া ভাত চাইল। গৃহকর্ত্রী কাজ ফেলিয়া না উঠিয়া বলিল বৌমা, দুইছেলের ভাত বাড়া আছে আনিয়া দাও। পুত্রদ্বয় আহারে বসিল। জ্যেষ্ঠপুত্র আহারের পরই যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। কাঠবিষ খাইলে যে সকল লক্ষণ হয় তাহাই প্রকাশ পাইল। রাত্রেই বালিকা বিধবা হইয়া নিশ্চিন্ত হইল। আমার নিকট আনীত হইলে স্বীকার করিল যে রামপুরহাটের এক ধনিষ্ঠ সুঁড়ি লোকদ্বারা তাহাকে ঐ বিষ পাঠাইয়াছিল .ও সে বলিয়াছিল, তোকে যদি মাসীর ঘরে

না আসিতে দেয় বা উৎপীড়ন করে তবে এই বস্তু ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া তোর স্বামীকে খেতে দিস, তবে আর কিছু বলিবে না। তাই ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিল।

সেসন কোর্টে বুঝিলেন যে বালিকার স্বামীঘাতিনী হইবার ইচ্ছা ছিল না, অত্যাচার নিবারণেব জন্য লোকেব পরামর্শ অনুসারে এই কার্য্য করিয়াছে। সাজা দুই বৎসব কয়েদ।

নির্ব্বুদ্ধি ও সাহস

একটী মুসলমান বালিকা, বয়স ১২ বৎসর। ইহার পিতা দরিদ্র, স্বামী গ্রাম্য চৌকিদার। চৌকিদার একা মানুষ, গৃহে আর কেহ ছিল না, তাহার বয়স ৩০ বৎসরের কম নহে। গৃহের কার্য্য বালিকা স্ত্রী একা সমাপ্ত করিত। ইহার পর চৌকিদার রাত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিশীথ সময়ে আসিয়া পান তামাক খাইত, বালিকার নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে হইত। স্বামীগৃহের স্বচ্ছলতা ও পিতৃগৃহেব দৈন্য দেখিয়া বালিকা মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ পিতাকে চাউল লবণ দিত। স্বামী জানিতে পাইলে তাড়না করিত, কখনও কখনও আঘাতও করিত। বালিকা ক্রমে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। একদিন চৌকিদার একখানা নূতন দা অস্ত্র সখ করিয়া গড়াইয়া আনিল ও তাহা ঘসিয়া মাজিয়া তৈল দিয়া

রাখিল। চৌকিদার রাত্রি দুই প্রহরের পর গৃহে ফিরিল ও বালিকা তাহাকে তামাক লাগাইয়া দিল। তামাক খাইয়া চৌকিদার শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা গেল। তাহার স্ত্রী তখন ঐ দা খানা লইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গলায় এক কোপ দিল; এক কোপে গলার অধিকাংশ দ্বিভাগ হইল; দ্বিতীয় কোপ মাথায় লাগিল ও তখনই পঞ্চত্ব পাইল। বালিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া শিকল লাগাইয়া সেই রাত্রেই অর্দ্ধক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে গেল ও পিতাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল। পিতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে আসিয়া সকলকে ডাকিয়া জামাতার গৃহের দ্বার খুলিতে বলিল। পরে পুলিশ আসিল। বালিকা সমস্ত কথাই আমার নিকট স্বীকার করিল ও সেসনে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস প্রাপ্ত হইল।

কৌলিন্য

বাঁকুড়া জেলার কোন গ্রামে রামেন্দ্র ওঝা (উপাধ্যায়) এক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণের বয়স ৫০ বৎসর হইবে, যথেষ্ট বলিষ্ঠ। তাহার উপজীবিকা কৃষিবৃত্তি হইলেও সে সঙ্গতিপন্ন। তাহার প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী কুমুদিনীকে গৃহে আনে। কুমুদিনীর গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। কন্যার বয়স তখন ৮ বৎসর, পুত্রের বয়স ৪ বৎসর। ব্রাহ্মণ

আর একটী বিবাহ করে, কেন তাহার কারণ পাওয়া যায় না। কুমুদিনী কুৎসিতা নহে, বরং সুরূপা বলা যাইতে পারে। কুলীন ব্রাহ্মণ বোধ হয় অনুরোধে পড়িয়া এই কুকর্ম্ম করিয়া থাকিবে। ইহার পর কুমুদিনীর প্রতি অযত্ন হয়, সেও অত্যন্ত রাগী, সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার অল্পই ছিল। পিতৃকুলে তাহার বিশেষ কেহই ছিল না। একদিন রাত্রে নিতান্ত দর্পের বশীভূত হইয়া সে পুত্রকন্যা লইয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করে, অভিপ্রায় পিতৃগৃহে যাইবে। পিতৃগৃহ সেখান হইতে ২০।২২ মাইল হইবে। পথে রাত্র প্রভাত হইলে বিপিন মুখুজ্যে নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইল। বিপিন যুবা পুরুষ, বংশজ, বিবাহ হয় নাই, কারণ বিবাহে অনেক টাকা লাগে। তাহাব গৃহে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। তাহার সঙ্গে কথা হইয়া স্থির হইল যে কুমুদিনী ঐ কন্যা তাহাকে বিবাহ দিবে ও সে ৭০০৲ টাকা পাইবে। কুমুদিনী কন্যাপুত্র লইয়া ঐ গৃহের গৃহিণী হইয়া বাস করিতে লাগিল। রামচন্দ্র কিছুদিন স্ত্রীর অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে সংবাদ পাইল। একদিন অকস্মাৎ বিপিনের গৃহে প্রবেশ করিয়া বালকটীকে লইয়া অন্তর্ধান হয়। গৃহে গিয়া কুশ পুত্তলিকা দাহ করিল, ও শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিল। বিপিন তখন নিশ্চিন্ত হইয়া কন্যাটীকে বিবাহ করে। বিবাহের এক বৎসর পরে বিপিনের সহিত কুমুদিনীর বিবাদ বাধে। কুমুদিনী বলে বিপিন প্রতিশ্রুত টাকা তাহাকে দেয় নাই। এক রাত্রে কুমুদিনী কন্যা লইয়া বিপিনের গৃহ ত্যাগ করিয়া

চলিল। আর এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় লয়। সেখানে প্রকাশ করিল তাহার কন্যার বিবাহ হয় নাই। কুলীন কন্যার বিবাহের বর শীঘ্রই জুটিল। হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিল। বিপিন সন্ধান পাইয়া ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় লয়। মানভূমের এক Dy. Magistrate স্ত্রী হরণের সাহায্যকারী অপরাধে কুমুদিনীকে ও নূতন জামাতাকে কঠিন শাস্তি দেন, জেল ও নির্জ্জন কারাবাস। স্ত্রীলোকের প্রতি ৬ মাস নির্জ্জন কারাবাস দণ্ড আর কখন শুনি নাই। আপিলে জজ সাহেব তাহাদের খালাস দিলেন, বলেন যে সাজা আইনবিরুদ্ধ ও মানভূমে এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না। তারপর বিপিন বর্দ্ধমানে আসিয়া আমার নিকট নালিশ করে। আমি উহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ করিলাম। সেসন আদালতে হরেন্দ্রের সামান্য সাজা হইল, কুমুদিনীর দুই বৎসর কারাদণ্ড হইল। কুমুদিনী আদালত হইতে বাহির হইয়াই দেখিল বিপিন ও তাহার কন্যা এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "শোন বিপিন, ও তোর মা, যদি উহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিস তবে মাতৃগমন পাপে তোর চৌদ্দ পুরুষ নরকে যাইবে।"

ইংগলস্ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট

ইনি অতি সজ্জন, সরলপ্রকৃতি, প্রায়ই হাস্যবদন। একটু আস্ফালনপ্রিয়। কাছারীর সময় কোন কার্য্যে (বিশেষ কার্য্য না থাকিলে আমি কখনও কাহার নিকট যাইতাম না) তাঁহার ঘরে গেলে দেখা যাইত স্তূপাকার কাগজের বাণ্ডিলে দুই টেবিল বোঝাই। আমার কার্য্য শেষ হইলে সহজে উঠিবার উপায় ছিল না। তাঁহার গল্প বা বক্তৃতা শুনিতে হইবে। তাঁহার গল্পের এক বিশেষত্ব ছিল যে কথার ছেদ ছিল না, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ লইতেন না। হঠাৎ কোন বাক্য বিস্মরণ হইলে থামিয়া যাইতে হয় সে সময়টুকু এঁ্যা— করিয়া দখল রাখেন পাছে শ্রোতা কোন উত্তর দেয় বা মনে করে কথা শেষ হইয়াছে। নিজের কাজের ক্ষতি হয় ও তাঁহার স্তূপাকার বাণ্ডিল সকলের উপায় কি হইবে মনে করিয়া কথার মধ্যে ছেদ পাইবা-মাত্র উঠিয়া· দাঁড়াইলে নিস্তার নাই, তিনিও উঠিবেন, দরজার দিকে পিঠ কবিয়া গল্প চলিবে। বাহির হইবার উপায় নাই, শুনিতেই হইবে।

তিনি মফঃস্বলে থাকিতে সাধারণ সমস্ত কার্য্য আমি করিতাম। একদিন মফঃস্বল হইতে হঠাৎ প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন কলিকাতা যাইতেছেন। দুইদিন পরে আসিবেন। তাহার দুই দিন পরে এক রবিবারে তাঁহার পত্র পাইলাম যে বেলা দুইটার সময় সেরেস্তাদারের সঙ্গে তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখা

করিতে হইবে। পত্র কলিকাতা Revenue বোর্ড অফিস হইতে। পূর্ব্বে তিনি Board-এব সেক্রেটারী অনেক দিন ছিলেন।

আমরা দুইজন বারাণ্ডায় পৌঁছিতে অতি ত্রস্তভাবে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বসিবার ঘরে আমাকে ডাকিলেন। প্রবেশ কবিবামাত্র দেখি তিনি ক্রোধভরে বক্তৃতা আবম্ভ করিলেন, বক্তৃতার স্রোত অনর্গল, বসিয়া দাঁড়াইয়া অস্থির, চেয়ারখানি ভাঙ্গিয়া গেল। আমার প্রতি অনুযোগ হইতেছে। কি বিষয়ে বুঝিতে পাবি না, এই মাত্র বুঝিলাম যে আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছি, আর কখনও কোন Dy. Magistrate-কে অফিসেব ভার দিবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় ১৫ মিনিট বাক্য বর্ষণের পর আমার রাগ হইল। আমিও উচ্চস্বরে বলিলাম আপনি কি বলেন, কি দোষ করিয়াছি তাহা আগে বুঝি। তখন একটু সামলাইয়া "তোমার রাগ করিবার হেতু নাই, আমার যথেষ্ট আছে।" তখন কিছু স্পষ্ট বুঝিলাম যে একটা বিশেষ গভর্ণমেণ্টের Circular তিনি দেখেন নাই, ও মনে করিয়াছেন আমরা অগ্রাহ্য করিয়া দেখাই নাই। আবার বাক্যস্রোত চলিল। তখন মনে করিলাম আমি একাই বা এ বাচালতা সহ্য কবি কেন? সেরেস্তাদাবকে ডাকিলাম।

সে ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাকে ছাড়িয়া তাহাব 'পরে প্রবাদ চলিল। সে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার দিকে চায়, "মহাশয় কি হইয়াছে?" আমি একটু একটু হাসি, প্রবাদ

শেষ না হইলে ত উত্তর চলে না। যখন শেষ হইল তখন বলিলাম, এই সার্কুলার যেদিন সাহেব কলিকাতায় যান সেই-দিন সকালে মাত্র ডাকে পৌঁছিয়াছে। আমি ডাক খুলিয়া সেরেস্তাদারের কাছে দিয়াছিলাম, সাহেবের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এইটুকু কথা তাঁহাকে বুঝাইতে এক ঘণ্টা সময় লাগিল। বুঝিয়া তখন কিছু লজ্জিত হইলেন। সেটুকু বুঝিবার এই মাত্র কারণ যে আমি তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া উঠান ছাড়িয়া গেট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি এমন সময়ে নিজে একটী Pencil হাতে করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া 'এ Pencil টা ফেলিয়া যাচ্ছিলে' বলিয়া আমার হাতে দিলেন। তাঁহার এত দুঃখ ও অপমানিত বোধের কারণ এই যে বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁহাকে এই Circular সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নাই ও যে বিষয়ে এই Circular তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। প্রায় দুই বৎসর তিনি বিলাতে ছিলেন, ছুটীর পরই বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন, তিনি সে বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। কাজেই যখন তাঁহাকে বোর্ডে মৌখিক প্রশ্ন করে তখন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান Treasury-র খাজাঞ্চির তহবিল হইতে ১০০০৲ টাকা কাছারির সময় চুরি গেল। আমি সংবাদ পাইয়া Treasury-তে যাইয়া তদন্তের জন্য পুলিশ নিযুক্ত প্রভৃতি যা কর্ত্তব্য করিলাম। ইংগলস্ সাহেব মফঃস্বল হইতে আসিয়া

২।৪ লম্ফ প্রদান করিয়া বলেন "তোমরা কিছুই পার না, আমি থাকিলে দুই মিনিটের মধ্যে টাকা বাহির করিতাম।" মনে মনে বলিলাম 'আপনার লম্ফ ঝম্প দেখিলে চোর আসিয়া টাকা দাখিল করিত।'

আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র অশ্বারোহণের উপযুক্ততা সম্বন্ধে পত্র লইবার জন্য উপস্থিত হয়। তাহার পরীক্ষার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'না আর কিছুদিন অভ্যাস করিতে হইবে।' সপ্তাহ পরে সে আবার উপস্থিত হইল। ইংগলস্ সাহেব আমাকে বলিলেন 'চল', আমি কার্য্যের অছিলা করিয়া গেলাম না। আসল কথা বুঝিলাম, আমি উপস্থিত থাকিলে নিজের অশ্বচালনার বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বেচারীকে অপারগ বলিবেন, উপস্থিত না থাকাই ভাল। ফলও তাহাই হইল, ভ্রাতুষ্পুত্র সেবার অশ্বারোহণে সক্ষম বলিয়া অভিনন্দন পত্র সহজেই পাইল।

ভূমি দখল

বনগ্রাম যাইবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে দুইটী ভূমি দখলের মোকদ্দমা মুলতুবী ছিল। দুই পক্ষে বহু বহু সাক্ষীর ফর্দ্দ জবাবাদি দাখিল হইয়াছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা এ বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেন নাই। পক্ষদিগকে বলিলাম তোমরা আমিন নিযুক্ত কর, আমি মফঃস্বলে যাইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিব।

ভূমিতে যাইয়া Survey নক্সা ও জমির আইল দেখিয়া দুই গ্রামের সীমানার মধ্যে যে জলা ছিল তাহাতে এক লম্বা দড়ির রেখা টানিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে বিনা সাক্ষীতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিলাম। পরে জানিলাম জমিদারেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ম্যানেজার, আমলা উকিলগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক আপিল আর হইল না।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। যে বিচারক প্রশংসা বা reputation খোঁজেন তাঁহার পক্ষে যথার্থ ন্যায় বিচার করা কঠিন। আর, যে বিচারক পক্ষদিগের মঙ্গল কামনা করেন, অর্থাৎ পক্ষদিগের ব্যয় অল্প হয়, শীঘ্র বিবাদের বিষয় নিষ্পত্তি হয়, এই যাঁহাব উদ্দেশ্য তিনি কখনই প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। তিনি সাধারণের নিন্দার পাত্র, নির্ব্বোধ, যথেচ্ছাচারী বলিয়া পরিগণিত ও উকিলদিগের চক্ষুশূল হইয়া উঠেন। তাহার সপক্ষে কথা বলিবার লোক কেহই নাই। উকিল মোক্তারগণের আয় কমিয়া যায় বলিয়া তাহারাও শত্রু হইবেই। সাধারণ লোক উকিল মোক্তারের মুখাপেক্ষী, তাঁহারা নিন্দা করিলে সকলেই নিন্দা করিবে। আর পক্ষগণ যাঁহারা উপকৃত হইল তাহারা যদি বুদ্ধিমান হয় তবে অবশ্য প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু তাহারা ত নানাস্থান বাসা, মোকদ্দমা শেষ হইলে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। প্রায়ই দরিদ্র বা মূর্খ, তাহাদের মতাভিমত কি আছে, থাকিলেও সহরে বিচারস্থানে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনা নাই। মনে কর একটা

হাঙ্গামার মোকদ্দমা, দুইপক্ষই সঙ্গতিশালী, দুইপক্ষেই উকিল মোক্তার আছেন। বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেছে, প্রতিবাদীর উকিল জেরা সে সময় করিতে চান না, পরে করিবেন। আদালত হইতে ২।৪টা জেরা হইল। বাদীর সাক্ষ্য শেষ হইল। তখন প্রতিবাদী জেরা করিবেন অথবা চার্জ্জ লেখা হইলে করিবেন, সময় চান, এমন সময় মোকদ্দমা রায় হইয়া গেল আসামী খালাস হইল। আসামীর ত সম্পূর্ণ লাভ, বাদীরও যথেষ্ট লাভ, বৃথা টাকা খরচ হইল না। কিন্তু দুইপক্ষের উকিল মোক্তারের অবস্থা কি শোচনীয়। এরূপ আমার কাছে অনেকবার হইয়াছে। এরূপ বিচারকের কখনও প্রশংসা পাওয়া অসম্ভব অথবা লোকপ্রিয় হওয়া অসম্ভব।

অন্যরূপ দেখা যাউক। আদালত হইতে জেরা হইল না। চার্জ্জ হইল, উকিলের প্রার্থনামতে জেরার দিন পড়িল। ২।৩ দিন জেরা হইল। পরে বক্তৃতার দিন পড়িল। দুই পক্ষে বক্তৃতা হইল, পরে রায় হইল। উকিলগণ তিন চার দিনের ফি পাইলেন। বক্তৃতার দিন বেশী ফি, খালাস হইল। প্রতিবাদীর উকিল পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক ও তাঁহার খোসনাম সঙ্গিন মোকদ্দমা খালাস করিয়াছেন। বাদীর উকিলও বলিলেন তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, পরিশ্রম করিয়াছেন। খালাস হইয়া গেল, কিন্তু জব্দ হইয়াছে, অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। বাদীরও মনে উহাই, আসামী খালাস হউক না কেন, জব্দ হইয়াছে। হাকিম শান্ত, গম্ভীর, সুবুদ্ধি, ধীর

বিচার হইয়াছে। এই রকম হাকিমের প্রতি সকলেরই ভক্তি, তিনি অন্যত্র যাইবার সময় অনেক টাকা চাঁদা উঠিয়া তাঁহার অভিনন্দন করা, সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা ও স্থানীয় ভদ্রলোক মাত্রেই তাঁহার বিরহে শোকে অধীর ইত্যাদি।

বর্দ্ধমান নগর

বাঙ্গালা দেশের সকল ক্ষুদ্র সহরের ন্যায় বর্দ্ধমান অপরিচ্ছন্ন, ময়লা জল বাহির করিবার উপায় নাই। প্রণালী সকল দুর্গন্ধময়, পতিত জমি আবর্জ্জনাপূর্ণ। জলের কল আছে, কিন্তু তাহার জল উপযুক্তরূপে filtered বা পরিষ্কৃত বা পবিত্র হয় না। অসংখ্য জলাশয় বিবর্ণ জলপূর্ণ, জ্বরের প্রকোপ যথেষ্ট। সুস্থ সবলকায় লোক বিরল।

অনেক রকম ওজন ব্যবহার হয়, ৬০ তোলা হইতে ৮২ তোলা পর্য্যন্ত সের চলিত। দোকানদারগণ সহজেই বঞ্চনা করিতে পারে। ভৃত্যদিগকে কিছু কিছু ঘুষ দিয়া প্রভুদিগকে নিকৃষ্ট তৈজসপত্র সরবরাহ করে, ওজনেও কম করিয়া দেয়। মৎস্য বিরল। মফঃস্বলে মৎস্যের নিতান্ত অভাব। জমি উর্ব্বরা, কিন্তু হনুমানের অত্যাচারে তরকারি মহার্ঘ।

আমি জ্বর ও কাশিতে অনেক ভুগিয়াছি। কাশির জ্বালায় প্রায় নিদ্রা হইত না। ডাক্তারি ঔষধে কোন ফল হইল না, তখন কবিরাজী আরম্ভ করিলাম। তাহাতে অনেক সাম্য হইল,

কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলাম না। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ রায় মহারাজের হাঁসপাতালের কর্ত্তা ও কবিরাজ কুলদা প্রসাদ সেন রাজবৈদ্য। দুইজনই অতি সজ্জন ও বিজ্ঞ। তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। গৃহিণী ও সন্তানগণও অনেকবার জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। মনে মনে কল্পনা ছিল যে গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই। আমার জমিদারী নাই, জমাজমিও নাই, স্বগৃহের প্রয়োজনও নাই। থাকিবার জন্য ভাড়াটে বাড়ী যথেষ্ট, কিন্তু যখন বনগ্রাম হইতে বর্দ্ধমানে আসি তখন বহু কষ্টেও কলিকাতায় উপযুক্ত ভাড়াটে বাড়ী পাইলাম না। সেইজন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলে তিনি তাঁহার গৃহের নিকট একটী সামান্য গৃহ আমার জন্য খরিদ করিয়া তাহাই বৃদ্ধি করিয়া আমার বাসোপযোগী করিয়া দিলেন। এতকাল কার্য্য হইতে অবসর লই নাই, এখন অবসর লইয়া বাস করিবার স্থান হইল। ১৮৯৫ সালে তিন মাসের বিদায় লইয়া কৃষ্ণনগর আসিলাম।

বর্দ্ধমান থাকিতে আমার প্রথমা কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহ হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর। কন্যার বিবাহ দেওয়া বিষম ব্যাপার। প্রথম ভাবিবার বিষয় যে বিবাহ দেওয়া উচিত কিনা, যে দেশে বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হয়, আর বিধবা হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া বিষাদ-

সাগরে মগ্ন হয় সে দেশে বা সে সমাজে কন্যার বিবাহ না দিয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া ও যথাসম্ভব সম্পত্তি দিয়া তাহাকে স্বাধীন করা কি উচিত নহে ? আমাদের ন্যায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে কন্যার বিবাহে তিন হইতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়। এই টাকায় এক ব্যক্তি পুরুষ বা কন্যা চিরজীবন অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে। উত্তম শিক্ষা পাইলে সৎপথেও থাকিতে পারে। বিবাহ দিলে শিক্ষা ত নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া যায়, আবার বিধবা হইলে এই টাকাগুলি বৃথা নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পাত্র দুর্ঘট, সঙ্গতিপন্ন লোক দেশে অল্প, আবার যাহারা সম্পত্তিশালী তাহারা শিক্ষিত নহে। বালিকার বিবাহ বালকের সঙ্গেই দিতে হয়। বালক উপযুক্ত-রূপে শিক্ষিত হইবে কিনা, শিক্ষিত হইলেই যে উপার্জ্জনক্ষম হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তাহার স্বভাব উত্তরকালে কিরূপ হইবে তাহাও অজ্ঞেয়। এই সকল বিষয় বহু চিন্তা করিয়াছিলাম। সদ্‌বুদ্ধি পাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহার আশীর্ব্বাদে ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেরূপ কোন বিপদ হয় নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার দুইটী কন্যা, দুইজনই সৎপ্রকৃতি, সুশীলা ও দেশানুরূপ শিক্ষিতা। বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পড়িতে উপযুক্ত ও সুবুদ্ধি পরায়ণা। প্রথমটীকে বাদ্য শিক্ষা দিতে যত্ন করিয়াছিলাম, নৃত্য এদেশের লোকাচার বিরুদ্ধ, বাদ্যও প্রায়

তাই। আব এক কলাবিদ্যা চিত্রাঙ্কন, তাহার শিক্ষকের সম্পূর্ণ অভাব। তবে পুস্তকাদি সংগ্রহ কবিয়া পুত্রকন্যাদিগকে দিয়াছিলাম। তাহাতে কেহই মনোযোগ দিল না। এই সকল কলাবিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। কন্যারা শ্বশুরালয়ে গেলে বিভিন্ন সংস্রবে তাহাদের পিতৃগৃহের শিক্ষা পরিত্যক্ত হইয়া যায়। গীতবাদ্য সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ, কাজেই অনর্থক। তবে চিত্রাঙ্কন সেরূপ বিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শিখিবাব কোন উপায় নাই।

পুত্রদিগকে ইহা ভিন্ন কুস্তি, অশ্বাবোহণ, নানাবিধ ব্যায়াম শিক্ষা দিবাব চেষ্টাও করিয়াছিলাম, ইহা ভিন্ন শিল্পকার্য্য বিশেষ সূত্রধবের কাজ অভ্যাস করাইতে আযাস পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যামাত্রই মানসিক গতির উপর নির্ভর করে। সখ বা শিক্ষা-প্রবণতা না থাকিলে পৈতৃক শাসনে কোন বিদ্যাই আয়ত্ত হয় না। পঞ্চপুত্র সকলেই শাস্ত্রাধ্যায়নে উপযুক্ত। অন্য কোন বিষয়ে প্রবণতা কেহই প্রকাশ কবে নাই, প্রথমটী অল্পদিন বাদ্যযন্ত্রপ্রিয় হইতে দেখা গিয়াছিল এই মাত্র।

আমার সন্তানগণেব কথা ছাড়িয়া বাঙ্গালা দেশের বালক বালিকাগণের রুচি ও শিক্ষাপ্রবণতা অনুধাবন কবিলে দেখা যায় যে শিল্পে ও কলাবিদ্যায় রুচি অত্যন্ত বিরল। সহস্র সহস্র বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ কবিতেছে, সকলেই পুস্তক পাঠ, শাস্ত্রাভ্যাস, জ্ঞানানুশীলনে সক্ষম কিন্তু কলা ও শিল্পে হস্তচালনে কেবল অক্ষম নহে, নিতান্ত অনভিরুচি।

সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বালক অধ্যয়ন করে তাহার অন্তত: তিনগুণ অধিক বালক কলা ও শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। আর এ দেশে কলা ও শিল্প বিদ্যার এতদূর অনাদর হইবাব কারণ কি ?

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এ দেশের প্রথম চক্ষু উন্মেষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে অনেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহাই অধিক মঙ্গলদায়ক। কারণ অপার কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন, নানা কুধর্ম্ম-পুরোহিত প্রভাবিত, সংখ্যাতীত জাতি বিভাগে বিচ্ছিন্ন, অসংখ্য সামাজিক সোপান পরম্পবায় বিভক্ত মনুষ্যগণের প্রথম শাস্ত্রাধ্যায়নই আবশ্যক। কুসংস্কারেব অন্ধকার দূর করা, কুধর্ম্মের নিগড় ভগ্ন করা, জাতি ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করা ও সামাজিক সোপানের বন্ধুবতা খর্ব্ব কবা, বিচার শক্তির উদ্বোধন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বিচার শক্তির উদ্বোধন করিতে হইলে জ্ঞানানুশীলন ও শাস্ত্র চর্চ্চা চাই। দৈবানুগ্রহে জ্ঞানানুশীলন দেশে এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ও তাহার ফলে যে বিচার শক্তি অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও নিশ্চয়, কিন্তু উপরোক্ত পাপসকল অদ্যাপি যথেষ্ট প্রবল আছে। তাহাদের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে বটে; কিন্তু বহুকালের বর্দ্ধিত সুদৃঢ় কাণ্ড শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নহে, কালক্রমে যে তাহারা নিস্তেজ হইয়া আসিবে তাহার নিদর্শন বিরল নহে। এখন অন্যদিকে দৃষ্টি করিবার অবসর হইয়াছে। এখন দেখিতে পাইতেছি যে কেবল কৃষিকার্য্যের

উপর নির্ভর করিয়া দেশ দরিদ্র হইয়া আসিতেছে। শিল্প দেশ হইতে প্রায় তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী, বাণিজ্য বিদেশীর হস্তে। কৃষি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। এরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইব। অতএব যাহাতে দেশে শিল্প প্রচলিত হয় তাহার যত্ন করা আবশ্যক। বালকগণের যাহাতে শিল্পে রুচি হয়, যাহাতে তাহারা হস্ত সঞ্চালন করিতে শেখে তাহাই করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ধনী মানী ও জ্ঞানী লোকেরা এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে অবশ্য শীঘ্রই ফল পাওয়া যাইবে।

অবসর

(২ আগষ্ট, ১৮৯৫ হইতে ১১ই নভেম্বর ১৮৯৫)

আমি ১৫ বৎসর অবকাশ লই নাই, তাহার এক কারণ আমার শরীর প্রায়ই সুস্থ ছিল, আর অবকাশ লইয়া থাকিবার স্থান ছিল না। নিজের গৃহ নাই, কোথায় থাকিব?

১৮৯৫ সালে কৃষ্ণনগরে আমার গৃহ প্রস্তুত হইল। আমারও শরীর ম্যালেরিয়া, কাশি, হাঁপানি কাশিতে যথেষ্ট উৎপীড়িত। তিনবার প্রার্থনা, ডাক্তারের অনুরোধ সমস্তই বিফল হইল। পরে অনেক আয়াসে সফল হইলাম। তিন মাসে আরাম,

বিশেষ দ্বিপ্রহরে নিদ্রায় শরীর সুস্থ ও সবল হইল। পুরাতন বচন "মা দিবা স্বাপ্সীঃ" ছাত্র, ব্রহ্মচারীদিগের জন্য প্রযোজ্য, গৃহস্থের জন্য বিশেষ গ্রীষ্মকালে ইহার ফল বিপরীত।

সেপ্টেম্বর মাসে আমার কনিষ্ঠ পুত্র সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে একবার যশোহর গিয়াছিলাম। তখন আমার সম্বন্ধী যোগেন্দ্র সেখানে উকিল। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার গ্রামস্থ গৃহে ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সেই সুপ্রসন্ন বদন আর দেখা হইল না। এমন সদাশয়, অমায়িক, নিরহঙ্কার লোক অল্পই পাওয়া যায়।

শ্যামাচরণ মৈত্রেয়

একদিন কৃষ্ণনগরে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, পথে শ্যামাচরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহার ২১ বৎসর পূর্ব্বে যখন হুগ্‌লি Civil Service Class-এ পড়ি তখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কিন্তু তাহার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন তিনি তেজপুরে ওকালতি করেন। তাঁহার নিবাস পাবনা। দুই জনে গল্প করিতে করিতে এক বন্ধুর গৃহে যাইয়া বসিলাম। সেখানে নানা কথার মধ্যে প্রকাশ

হইল যে তিনি একখানা এণ্ডি বস্ত্র তাঁহার এক বন্ধুকে উপহার দিবার জন্য আনিয়াছেন। আমি এণ্ডি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই, বলিলাম যদি আমি একটা পাই তবে একজোড়া কোটপ্যাণ্ট প্রস্তুত করি। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন যে তাঁহার বন্ধুর অর্দ্ধ থান প্রয়োজন, বাকি অর্দ্ধেকে আমার কার্য্য হইতে পারে। ইহা বলিতে বলিতে সম্মুখে এক দর্জ্জি উপস্থিত হইল, সে আমার শরীরের মাপ লইয়া অর্দ্ধখানাতে আমার বস্ত্র প্রস্তুত করিবে বলিল। আমি কোন আপত্তি করিতে আর অবসর পাইলাম না।

পরদিন তিনি পাবনা যাইবেন, আমি কলিকাতায় যাইব। দুইজনে আমার গৃহে আহার করিয়া এক গাড়িতে বগুলা যাত্রা করিলাম। পথে আমি এণ্ডির মূল্য ৮৲ টাকা দিতে গেলে তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে তিনি আমার নিকট ঋণী আছেন। এতকাল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কিরূপে তিনি ঋণী হইতে পারেন এজন্য আমি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন যে যখন হুগ্‌লিতে আমরা পড়ি তখন এক দিবস আমরা কয়জনে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া চন্দননগর গিয়াছিলাম, সেই গাড়ি ভাড়া আমি দিয়াছিলাম, তাঁহার অংশ ।৶০ ছয় আনা তাঁহার দেওয়া হয় নাই। সে কথা ত আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর ।৶০ আনার জন্য আমি ৮৲ টাকার দায়িক হইব কেন? তিনি কিছুতেই টাকা লইবেন না। তখন একটু ভাবিয়া এক কথা আমার স্মরণ হইল। আমি বলিলাম আমার জ্যেষ্ঠ

প্রসন্নবাবু বলিয়াছিলেন যে আসামের এক উকিল তাঁহাকে অনেক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি উপহার দিয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ উকিল বলিয়াছিলেন যে ইহা গুরু-দক্ষিণা অর্থাৎ যখন আমার জ্যেষ্ঠ কলেজে Law Lecturer ছিলেন তখন শ্যামাচরণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁহার নামও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম সে কি আপনি? শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন "হ্যাঁ, আমি তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছিলাম। যখন আমি Law class-এ পড়িতাম তখন তিনি আমার কলেজের বেতন দিতেন। কেন, তুমি ত' জান, যখন মাসের ১লা তারিখ তোমার দাদার মাহিনা লইতে তখন ৫৲ টাকা করিয়া দিয়া আসিতে।" সে কথা আমিও বিস্মৃত হইয়াছিলাম, দাদাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তখন আমার মনে প্রতিভাত হইল যে শ্যামাচরণ অতি মহাত্মা ব্যক্তি। ভক্তিতে আমার মন গদ্‌গদ হইল, আর ঐ ৮৲ টাকা লইবার জন্য জেদ করিতে আমার ক্ষমতায় কুলাইল না।

হাঁসখালি পৌঁছিয়া দেখি মোটে একখানা গাড়ী আছে, তাহাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক আরোহী, শ্যামাচরণ গাড়ীর উপরে উঠিলেন, আমি উপরে উঠিতে অনিচ্ছুক, কাজেই তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম, সেই চিরবিদায়। আর দেখা হয় নাই। সে মহাশয় এখন আর এ সংসারে নাই। এইরূপ লোক সংসারে অধিক থাকিলে কি সুখের সংসার হইত। কৃতজ্ঞতা এ সংসারে সুদুর্লভ। যাহার কৃতজ্ঞতা আছে, সে কখনও স্বার্থপর হইতে

পারে না। স্বার্থপরতা যত পাপের আকর। সমাজে পরস্পর উপকার আমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি। বাজারের দোকানদার, গৃহের ভৃত্য, পথের সঙ্গী প্রভৃতির নিকট কত সময় কত উপকার প্রাপ্ত হই যাহা আমরা পরক্ষণেই বিস্মৃত হইয়া থাকি। আমরা মনে করি যেন এ সমস্তই আমাদের প্রাপ্য, আমাদের অধিকার। ইংরাজেরা একটা ধন্যবাদ দেয়, আমরা তাহাও দিই না। ভৃত্য পরক্ষণেই এক সামান্য অপরাধ করিলে আমরা খাপ্পা হইয়া কতদিনের কত উপকার বিস্মৃত হই। দোকানদার ভ্রমক্রমে একটী পয়সা বেশি লইলে আমরা তখনই তাহাকে অশিষ্ট প্রবঞ্চক বলিয়া ধরিয়া লই। সাধারণতঃ আত্মীয়ের নিকট অর্থ সাহায্য লইয়া সকলেই তাহা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। সে সাহায্য যে তাহার প্রাপ্য, তাহার অধিকার, না পাইলে তাহার গালি দিবার অধিকার জন্মে। সম্মুখে না পারে, পিছনে দিবে। সে বিষয় চিন্তা করিলে সংসার কি কদর্য্য স্থান!

সামান্য ক্ষতি পাইলে সাধারণতঃ লোকে কতদূর রাগান্বিত হয়, তাহার দশগুণ প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সামান্য উপকারের বহু গুণ প্রতিশোধ দিতে চায় এমন শ্যামাচরণের মত কয়জন লোক দেখা যায়?

কুমিল্লা

(নভেম্বর ১৮৯৫—জুলাই ১৮৯৮)

কুমিল্লা স্বাস্থ্যকর স্থান, ম্যালেরিয়া বা কোন সংক্রামক রোগ দেখা যায় না। মহারাজের তিনটী দীঘি আছে, তাহার জল সুস্বাদু ও নির্দ্দোষ। গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহনীয় নহে, Fahr. ৯৩°-র উপরে কখনই উঠে না। বর্ষাও অধিক, শীতও অধিক। কিন্তু বাসোপযোগী গৃহ বিরল। কাদার মেঝে, বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল, এইরূপ গৃহেই বাস করিতে হয়। কিন্তু নূতন প্রস্তুত কাদার গৃহে শিশু সন্তানাদি লইয়া বাস করিয়াছি, কোন অসুখ হয় নাই। তরকারি মৎস্য ও দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। জলপূর্ণ খানা ও গর্ত্ত সহরের ভিতর অনেক। সহরের বাহিরে রাস্তা অল্পই আছে। পাকা রাস্তা একেবারে নাই। ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম যাইবার যে বৃহৎ রাস্তা আছে, তাহার মাঝখানে অনেক ঘাস জন্মে। গাড়ী অল্পই চলে, রেলওয়ে হইবার পর পথিকও বিরল। ধনী লোকে হাতীতে যাতায়াত করে। নদী বা খালে নৌকাদ্বারা ব্যবসাবাণিজ্য চলে। গৃহাদি দেখিলে বোধ হয় এস্থান নিতান্ত দরিদ্র লোকের বাসের উপযুক্ত, সুসভ্য ভদ্রলোক এখানে নাই। কিন্তু এদেশ উর্ব্বরা শস্যশালী, এবং সাধারণ লোক নিঃস্ব নহে। ভিক্ষুক অতি কম। লোকের আয়ের অভাব নাই। ব্যয় কেবল মোকদ্দমা করিতে। মুসলমান প্রধান দেশ, নিম্নশ্রেণী হিন্দু নাই বলিলে হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য

কায়স্থও অল্প। আর নিঃস্ব যদি কেহ থাকে, তবে তাহাদের মধ্যেই। কারণ কৃষিকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা। হিন্দুরা কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দেয় না। উচ্চবংশীয় মুসলমান এ প্রদেশে অনেক আছে। সকলেই সম্পত্তিশালী, দরিদ্র লোক মুসলমানের মধ্যে বিরল।

প্রথমে যে গৃহে উঠি সে গৃহে ভাল পায়খানা নাই। মফঃস্বলে যাইয়া দিন কতক ছিলাম, সেখানেও শৌচের স্থান দুষ্প্রাপ্য ও কষ্টকর, এইজন্য জ্বরে শয্যাগত হইলাম। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই বড়দিনের ছুটী আসিল। তখন চট্টগ্রাম হইতে ডাকগাড়ী লাকসাম হইয়া চাঁদপুর যাইত। কুমিল্লার সঙ্গে এই গাড়ীর সংস্রব হয় নাই। আমি এক বন্ধু সমভিব্যাহারে এক টম্‌টম্ গাড়ীতে ১৬ মাইল দূরে লাকসাম পৌঁছিলাম। বন্ধুর সঙ্গে কথা ছিল তিনি লাকসামে আহারের বন্দোবস্ত করিবেন। আমরা সন্ধ্যার সময় লাকসাম বাংলায় পৌঁছিয়া দেখি সেখানে কোন জনপ্রাণী নাই, শৌচগৃহ নাই, জল নাই, বসিবার আসন নাই, কেবল বাংলা মাত্র। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটী লোক আসিয়া বলিল মহাশয়রা চলুন, হাতী প্রস্তুত। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে এক মুসলমান জমিদারের গৃহ ওখান হইতে তিন মাইল দূরে, সেখানে আহার প্রস্তুত, আমাদের হস্তীপৃষ্ঠে যাইতে হইবে। আমি অন্ধকার রাত্রিতে হাতীতে যাইতে অস্বীকার করিলাম, জমিদারের কর্ম্মচারী একটু ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল যে পাল্কী বেহারা অপ্রাপ্য।

আমার সঙ্গীকে বলিলাম মহাশয় আপনি যান, আমি আর রাত্রিতে যাইব না। তাহার উত্তরে তিনি তাঁহার শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। কর্ম্মচারী হাতী ঠাণ্ডা, দূর অল্প, কোন কষ্ট হইবে না ইত্যাদি বকিতে লাগিল।

রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশাহ্ সকলেই হাতীতে গমনাগমন করিতেন। আমি সামান্য ব্যক্তি হইয়া রাত্রে হাতী চড়িতে ভয় পাই, ইহা লজ্জার কথা, বিশেষ আমার জন্য আর এক ব্যক্তি (বাবু গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এখন পাবনার ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) অনাহারে থাকিবেন—এই সব মনে করিয়া বলিলাম, চলুন, যাওয়া যাক্। বাহির হইয়া দেখি দুইটী হস্তী, একটী বৃহদাকার ও আর একটী ক্ষুদ্র। উঠিবার কোন উপায় নাই। বাংলায় খুঁজিয়া একখানি ভাঙ্গা মোড়া পাওয়া গেল, তাহাতে দাঁড়াইয়া ছোট হাতীতে উঠিলাম, পরে ছোট হাতী দাঁড়াইলে বড় হাতী বসিল, তাহাতে সহজে উঠা গেল। রাত্রি সূচীভেদ্য অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, বোধ হইল একটা খাল পার হইলাম। জমিদার গৃহে পৌছিলে অভ্যর্থনার ক্রুটী হইল না। একখানা আটচালা ঘরে বসিলাম। চেম্‌টে গন্ধ, অর্থাৎ সর্ব্বদা মুখনিঃসৃত দ্রব্যাদি শুকাইয়া যেরূপ গন্ধ হইতে পারে। জমিদার একজন স্ত্রীলোক। তিনি বিধবা, তাঁহার কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র গৃহেই থাকেন। তিনি শিক্ষিতা এবং গ্রন্থকর্ত্রী। গৃহ সমস্তই কাঁচা, মাটীর মেঝে ও বাঁশের বেড়া। ভিতরে সামান্য একটী একতালা পাকা ঘর

আছে। অর্থের অভাব নাই, কিন্তু দস্তুর এবম্বিধ। জামাতা ও বালক দৌহিত্রগণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে সে ঘরে যাইয়া দেখি ব্রাহ্মণ পোলোয়া, মাংস ও লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে। ঘৃত সুগন্ধ নহে, লুচি মোটা ও শক্ত, আর অধিক বর্ণনা প্রয়োজন করে না। আবার ফিরিবার সময় পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বিরদারোহণে লাকসাম আসিলাম। পৌঁছিয়া দেখি ছোট হাতী সঙ্গে আসে নাই। মাতঙ্গ বসিলে বন্ধু যুবাপুরুষ কোনক্রমে অবতরণ করিয়া বাংলায় ঢুকিলেন। এ ব্যক্তি কাছি ধরিয়া নামিতে হাতীর লেজের কাছে হাঁটু বাঁধিয়া গেল। মাথা হাতীর গুল্‌ফের নিকট পড়িল। অবস্থা শোচনীয়, মাহুত ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণী নাই। মাহুত বৃহৎকায়ের মস্তকে। তাহাকে স্থির থাকিতে বলিয়া কোনক্রমে স্থূল শরীর উঠাইয়া মস্তক উর্দ্ধে তুলিলাম। শরীরে কিঞ্চিৎ বেদনা হইল। তাহার ফল কৃষ্ণনগর আসিয়া জ্বর। তিন দিন প্রবল জ্বর, পরে বিরাম হইবামাত্র কুইনাইন সেবন করিয়া যাত্রা করিলাম। বগুলায় আসিয়া First Class টিকিট নিলাম। কিন্তু First, Second বা Inter Class-এ বসিবার স্থান পাইলাম না। ইংরাজ বাহাদুরগণ আলোক নামাইয়া শুইয়া আছেন। দুর্ব্বল শরীরে দৌড়াদৌড়ি করিতে অক্ষম। একটী Third Class দুয়ারের গায়ে বিছানা ফেলাইয়া কোনক্রমে বসিয়া পড়িলাম। তখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, জল সঙ্গেও নাই, শীত-কাল, রাত্রিতে পানিপাঁড়েও নাই। একজন হিন্দুস্থানী দয়া

করিয়া তাহার লোটায় জল দিল, তাহাতে কোনক্রমে জীবন ধারণ হইল। জাহাজেও ঐ অবস্থা, ডেকের উপর একটু ঘিরিয়া স্থান করিয়া দিল। খাদ্য চাহিলে জাহাজেব লোকেরা First Class-এর দস্তুরমত টাকা লইল, কিন্তু আহারের উপযুক্ত যৎসামান্য কিছু দিল। পরদিন লাকসাম হইতে পাল্কি করিয়া কুমিল্লা পৌঁছিলাম। কিছুদিন পরে কাঁদিরপাড়ে একটী বাটী ভাড়া পাইলাম। তাহাতে যাইয়া বাস করিলাম। কাঁচা ঘর, মাটীর মেঝে, দরজা ঝাপের। চৈত্রমাসে পরিবারগণ বহু কষ্ট পাইয়া কুমিল্লায় পৌঁছিল।

কুমিল্লায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার আছে। সেখানে অল্প স্বল্প পুস্তকাদি পাওয়া যাইত। কিন্তু আমাদের বসিবার আড্ডা ছিল শশীবাবু Engineer-এর গৃহে। পশ্চিম বাঙ্গালার Deputy Magistrate, Sub-Judge, Munsiff প্রায় সকলেই সেখানে সন্ধ্যার পর একত্র হইতেন।

গোপালচন্দ্র বসু সাবজজ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ অর্থাৎ তিনি নিজেকে অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ বলিয়া জানিতেন। তিনি অল্পদিন সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এক পণ্ডিতের নিকট উপনিষদ ও পঞ্চদশী পড়িতেন। তিনি একজন তার্কিক, কিন্তু অধিকক্ষণ প্রতিপক্ষকে সহ্য করিতে পারেন না। মর্ম্মান্তিক বাক্য প্রয়োগে তাহাকে জব্দ করিতে পারিলে তিনি সুখী হন। সকল তর্ক বিপক্ষের অজ্ঞতা, মূর্খতা বা ধৃষ্টতায় অবসান হয়। নূতন ব্রতী বলিয়া তাঁহার আর্য্যধর্ম্মের প্রতি ভক্তি প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুদেব

উপরোক্ত শশীবাবু অনেক দিন গল্পচ্ছলে নিজ গুরুদেবের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের বিষয় বলিয়াছিলেন। ঐ গুরুদেব পরম যোগী, জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং অনেকবার তাঁহাকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। স্বস্ত্যয়ন করিয়া অনেক কঠিন ব্যাধি আরাম করিয়াছেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ, যাহাকে যাহা বলেন তাহাই ঘটে। কিছুদিন এই সকল কথা শুনিয়া আমরা সকলেই এই অদ্ভুতকর্ম্মা লোকটিকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম। প্রত্যহ তাহার দৈব ক্ষমতার বিষয় শুনিতাম। শশীবাবু বলেন, যে বৎসর আষাঢ় মাসে Lawrence জাহাজে ডুবিয়া ৭০০ পুরীযাত্রী বাঙ্গালী জলমগ্ন হয়, সেই বৎসর বৈশাখ মাসে গুরুজী শশীবাবুর পরিবারদিগকে কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করেন ও বলেন যে এ বৎসর বঙ্গোপসাগরে অনেক প্রাণীহত্যা হইবে।

আর একবার শশীবাবু Commissioner সাহেবের সঙ্গে পদব্রজে কোন স্থানে যাইতেছিলেন, পথে ডাকপিয়ন একখানি পত্র দিল। পড়িবার অবকাশ না হওয়াতে তিনি উহা পকেটে রাখিলেন। এ দিকে চলিতে চলিতে তাঁহার পদস্খলন হইল, একের পর এক, তিনবার। পরে তিনি পত্র পড়িয়া জানিলেন গুরুদেব লিখিয়াছেন এইদিন তাঁহার কঠিন বিপদ হইবার কথা,

কিন্তু তিনি স্বস্ত্যয়ন করিয়া উহাকে খণ্ডন করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার তিনবার পদস্খলন হইবে।

শশীবাবু Engineer, ৬০০৲ টাকা মাহিনা ও রায় বাহাদুর। আমাদের আগ্রহাতিশয়ে গুরুদেব নিমন্ত্রিত হইয়া কুমিল্লায় অধিষ্ঠান করিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা সকলে শশীবাবুর গৃহে গুরুদেবকে ঘিরিয়া বসিতাম ও তাঁহার নিকট শাস্ত্রকথা শুনিতাম। তান্ত্রিক যোগ ও ক্রিয়াকলাপ ও কবচাদি সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শ্লোক অনেক গুরুদেবের কণ্ঠস্থ। তাহাই অনর্গল বক্তৃতা করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কবচ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনর্গল প্রবাহিত হইত। কিন্তু উচ্চারণ দোষ ও সন্ধির বিষম প্রয়োগে বুঝিলাম যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই। ধর্ম্মবিষয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে দুই একটী কথা বাঙ্গালায় বলিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের মন্ত্র ও কবচ আওড়াইতে থাকেন।

ক্রমে ৩ জন তাঁহার বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠিল। উপরোক্ত গোপালবাবু, বিরজাবাবু মুনসেফ্, ও ক্ষেত্রবাবু Deputy তাঁহারা সকলেই সস্ত্রীক দীক্ষা লইবেন স্থির হইল। গুরুদেব বলিলেন যে দীক্ষা দিয়া মূল্য গ্রহণ করা অশাস্ত্রীয় তবে দক্ষিণা একটী হরিতকী মাত্র দিলেই হইবে। গোপালবাবু প্রথমে বলিয়াছিলেন যে তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষা লইবেন। কিন্তু সকলেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, বিশেষ ঘটা করিয়া লইলেন। মিষ্টান্নমিতরে জনা, আমরা গুরুদেবের সঙ্গে পোলাও,

মাংস, মিষ্টান্ন প্রত্যেক শিষ্যের গৃহে ভোজন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। শিষ্যেরা সকলেই মন্ত্র জপ করেন। গোপালবাবু বলেন মন্ত্রের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। জপ করিবার সময় কালীমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নাচিয়া বেড়ায়, এবং তাঁহার স্ত্রী যখন জপ করিতে বসেন তখন নানা প্রকার অদ্ভুত শব্দ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরে গুরুদেবের এক প্রিয় শিষ্য আসিয়া জুটিল। শুনিলাম তিনি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিয়াছেন, বিশেষ শ্মশান তাঁহার অতি প্রিয় স্থান, সেখানে সাধনা করা তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। কালীঘাটের শ্মশানে অন্ধকার রাত্রে তিনি প্রায়ই ধ্যান করিতে বসেন। তাঁহার নিকট অনেক অলৌকিক ঘটনা শুনিলাম। তাহার মধ্যে একটী এই যে, একদিন তিনি হিমালয় শিখরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন এক জলস্রোত নামিয়া আসিতেছে, ও কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাহার ধারে অগ্নি জ্বালিয়া তৈলপূর্ণ কটাহ জ্বাল দিতেছে। ঐ স্রোতে একপ্রকার চঞ্চল জীব ভাসিয়া আসিতেছে, ব্রাহ্মণগণ বড় বড় লৌহহাতাদ্বারা ঐ জীবগণকে ধরিতেছে আর কটাহে ফেলিতেছে। তৎক্ষণাৎ জীবগণ প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়া শালগ্রাম শিলা হইতেছে। আর তিনি সেই প্রদেশ হইতে এক বাণলিঙ্গ আনিয়াছেন, তাহা সূর্য্য কিরণে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ আভা বিকীর্ণ করে। আমাকে স্পর্শ করিতে দিলেন না। দেখিলাম —বোধ হইল, রক্তবর্ণ কাঁচের ক্ষুদ্র গোলক Bead, ইনি বাইশ-

কর্ম্মা গুরুর বিয়াল্লিশকর্ম্মা শিষ্য। গুরুদেব কিছু দিন থাকিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তখন শুনিলাম শিষ্যদিগের প্রত্যেকের নিকট ৩০৲।৪০৲ টাকা আদায় করিয়াছেন ও বাৎসরিক প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন। ইতি গুরু মাহাত্ম্য।

কিছুদিন গোপালবাবুকে বিমনা দেখা গেল। তিনি তখন বলেন গুরুদেব তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছেন। মন্ত্র জপের প্রভাব বিষয়ে আর কোন কথা তাঁহার নিকট শুনিতাম না। বুঝিলাম মন্ত্রের প্রতি আস্থা ও সেই সঙ্গে গুরুদেবের প্রতি ভক্তি তিরোহিত হইয়াছে।

বেদে, উপনিষদে, যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে যে সকল মন্ত্র আছে তাহা যে প্রভূত ক্ষমতাশালী তাহা এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোপালবাবু পূর্ব্বেও করিতেন, পরেও করিতেন। সে বিশ্বাস তাঁহার যায় নাই। একদিন তিনি বলেন যে এমন এক মন্ত্র আছে যে তাহা উচ্চারণ করিয়া রৌদ্র পিঠে করিয়া যদি কোন ব্যক্তির প্রতি স্থির দৃষ্টি করা যায়, পরে তাহার প্রতিকৃতি আকাশে প্রতিভাত হয়। আর সেই সময়ে যদি তাহার মস্তক আকাশে না দেখা যায় তবে ঐ ব্যক্তি ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিয়া দেখাইলাম যে বিনামন্ত্রে কোন ব্যক্তির প্রতি সূর্য্য পিছনে রাখিয়া অল্পক্ষণ তাকাইলে পরে নীল আকাশে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। মস্তক দেখা যাউক বা না যাউক সে কৌশল সাপেক্ষ। যাহা হউক, আমি গোপালবাবুর মানসিক অবস্থার

কথা বলিতেছিলাম। যখন তিনি বুঝিলেন যে, বৃথা কতকগুলি অর্থ অপব্যয় হইয়াছে তখন তাঁহার মত কতকাংশে পরিবর্ত্তন হইল।

তন্ত্র

তন্ত্রে ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিতৃপ্ত করিতে পাবে। এ দেশীয় শিক্ষিত লোক মাত্রই মোক্ষপ্রাপ্তি চরম উদ্দেশ্য মনে করেন। প্রথমে ছিল ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বারা স্বর্গে গতি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত হইয়া স্বর্গ নিকৃস্ট সাধনায় পতিত হইল, নির্ব্বাণ চরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইল। হিন্দু শাস্ত্রে ও বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপে স্বর্গের পথ চিরপ্রসিদ্ধ থাকিলেও উপনিষদ, সাংখ্য, গীতা ঐ শাস্ত্রকে হীন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তি চরম উদ্দেশ্য স্থির করিলেন। তাহার পর দেশে যত শাস্ত্র হইযাছে সর্ব্বশাস্ত্রেই মোক্ষ একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া নির্দ্দিস্ট হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তির পথ যোগ। ইন্দ্রিয় সংযম, সর্ব্বভূতে দয়া, সন্ন্যাস, ত্যাগ প্রভৃতি অনেক দুরূহ ও কষ্টসাধ্য, অতি অল্প লোককে আকর্ষণ করিতে সক্ষম। উহাতে পুবোহিতের প্রয়োজন নাই। স্বর্গেব প্রতি অনাস্থা হইবাব জন্য যাগ-যজ্ঞও উঠিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও হিন্দু শাস্ত্রের মোক্ষমার্গ অপেক্ষা কোন অংশে কম দুরূহ নহে। বরং অধিক কঠোর। সাধাবণ অশিক্ষিত ও শিক্ষিত

লোকের জন্য সহজ উপায়ে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই উপায়ই তন্ত্র শাস্ত্র। মোক্ষমার্গ অগ্রে, কি গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ অগ্রে, বৌদ্ধ-তন্ত্র অগ্রে, কি হিন্দু তন্ত্র অগ্রে তাহার মীমাংসা করা আমার কার্য্য নহে। তন্ত্র অসংখ্য প্রকার ও হিন্দু তন্ত্র মাত্রেই মহাদেব বক্তা ও গৌরী শ্রোতা, সকলেই নানা উপায়ে মোক্ষমার্গ নির্দ্দেশ করিতেছে। সকলেই নানাপ্রকার ক্রিয়ার উপদেশ দেয়। নানাপ্রকার দেবদেবী ও নানা প্রকার উপাসনাও আছে। অনেকগুলিতে ইন্দ্রিয়াসক্তির চরিতার্থতাও মোক্ষের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সহজ পথ থাকিতে লোকে দুরূহ পথে কেন যাইবে?

কাম ও লোভ এই দুইটী মনুষ্যের প্রবল ইন্দ্রিয়। তন্ত্র পঞ্চমকার সাধনে প্রবৃত্তি দিয়া মনুষ্যকে সহজে হস্তগত করিতে পারে, এবং তাহাই করিয়াছিল। তবে হিন্দু মাত্রেই ঐ পথে যায় নাই। সকলে যদি যাইত তবে এদেশ উচ্ছন্ন যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মদ মাংস আহার ও উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রী পুরুষের সহবাস হইলে কোন সমাজ বহুদিন চলিতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয়, পুরাকালের সমাজ বন্ধনের গুণেই হউক, বা লোকের প্রবৃত্তির বিভিন্নতার জন্যই হউক, ইন্দ্রিয়াসক্তি অনেক লোকের নিকট ঘৃণিত। সে পথে পরকালে সদ্‌গতি হউক বা নাই হউক ইহকালে যে ধ্বংসে লইয়া যায় তাহা সকলেই দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে।

অদ্যাপি অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক তন্ত্র মার্গাবলম্বী। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিতৃপ্তির জন্য ঐ পথ অবলম্বন করে তাহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

অনেকে তন্ত্রের আশ্রয় লয় এই আশায় যে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। ষড়্ বিভূতির কোন না কোনটা তাহাদের আয়ত্ত হইবে, অথবা মারণ উচ্চাটন, বশীকরণ তাহাদের ইচ্ছাধীন হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত লোককে তন্ত্র যেমন পরিতুষ্ট করিতে পারে, অপর লোককে তেমন পারে না। তাহাদিগকে তন্ত্র বলে যে বহুকাল সাধনা করিতে হইবে, উপযুক্ত গুরু প্রয়োজন, সবল শরীর, অনেক অর্থ ব্যয়, প্রাণায়াম, যোগ, প্রভৃতি কঠোর চেষ্টা আবশ্যক। এই প্রলোভনে যাইয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

আমার বোধ হয় এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এক চতুর্থাংশ ও অল্প শিক্ষিত লোকদিগের অর্দ্ধেক এই পথাবলম্বী। কিন্তু সাধারণে ইহা প্রকাশ নাই। তন্ত্রের আদেশ এই যে গুহ্য ভাবে সাধনা করিতে হয়। কেহ যেন জানিতে না পায়। তাহার কারণও সহজে বোধগম্য। কারণ এই সকল প্রক্রিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ, সুসভ্যতা বিরুদ্ধ, সাংসারিক উন্নতির বিরুদ্ধ। প্রকাশ্যে এই সাধনা করিলে লোকের হাস্যাস্পদ বা ঘৃণিত হইতে হয়। তাঁহারা নিজেরা নিজের সর্ব্বনাশ করেন, পরিবারবর্গের ধ্বংস সাধন করেন, কিন্তু বাহিরের লোক কিছুই জানিতে পারে না।

'মালতীমাধব' নাটকে যে সকল কাণ্ড আছে ও ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' যে জ্ঞানের আস্ফালন করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি এ দেশে চলিত আছে।

কবি হেমচন্দ্রেব জীবন বৃত্তান্ত আমি পড়ি নাই, আমি জানিও না, কিন্তু তাঁহার 'দশ মহাবিদ্যা' কাব্য পাঠ করিয়া সন্দেহ হয় যে কবি শেষ কালে যে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই মাত্র।

ফলিত জ্যোতিষ

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাব যাহা বক্তব্য বলিয়া বাখি।

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে লোকমুখে যত প্রশংসা শোনা যায় তাহাতে বোধ হয় ইহা অব্যর্থ ও অতি আদবণীয় শাস্ত্র। Col. Meadows Taylor যে আত্মজীবনী লিখিযাছেন তাহা পাঠ কবিলে ভাবতীয় জ্যোতিষেব প্রতি ভক্তিপবাযণ না হইয়া কে থাকিতে পাবে! এ দেশেব ভদ্রাভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই ইহাব বিস্ময়কব ক্ষমতাব কথা বলিযা থাকেন। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি মাত্রই নিজের সন্তান জন্মিলে তাহাব কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রস্তুত কবেন। সমস্ত শুভকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি, গৃহ নির্ম্মাণ, বাণিজ্যারম্ভ, গৃহ প্রবেশ, পুষ্করিণী খনন, কোন বিশেষ কার্য্যারম্ভ, বিদেশ যাত্রা সমস্তই

জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত শুভ দিন দেখিয়া করিতে হয়। এই সকল নিয়ম পালন করিয়া আমাদের কি শুভ ফল হইয়াছে দেখা যাউক। বিধবার সংখ্যা হিন্দু সমাজে যত অধিক এত কোন দেশে কোন সমাজে নাই। ১৫ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কার মধ্যে হিন্দু বিধবা শতকরা ১৬ জন। ঐ বয়সের মুসলমান বিধবা ১২ জন মাত্র। মুসলমানের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত, সে কারণ এখানে খাটে না। নীচ জাতীয় হিন্দু বিধবাদের বিবাহ হইয়া থাকে এবং উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যে বিধবা বিবাহ নাই বলিলেই হয়। ৪০ বৎসর বয়সের উপরে বিধবা অনেক বেশী। ইহা ভিন্ন হিন্দুদের কাজ প্রায়ই নিষ্ফল। যুদ্ধে বিদেশীয় লোকের নিকট চিরকাল বিজিত। পারস্য (অসুর), আসিরিয়া, গ্রীস সর্ব্বদাই হিন্দুদিগকে পরাজিত করিত। মুসলমানগণ মহম্মদ কাশিমের সময় হইতে গজনীর মহম্মদ, ঘোরির মহম্মদ, বক্তিয়ার খিলিজি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ বিজয় করিয়াছিল।

সাধারণ কার্য্যে যে হিন্দুরা প্রায়ই নিষ্ফল হয় তাহার প্রমাণ আমাদের দৈন্যদশা। বাণিজ্যে কখনই কৃতী হইতে অদ্যাপি পারে নাই। সকল কার্য্যে পরমুখাপেক্ষী, জ্যোতিষীর দিনক্ষণ আমাদিগকে কিছুই সাহায্য করে না।

সামুদ্রিক গণনাও জ্যোতিষের অন্তর্গত। ইহা আমি পরীক্ষ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কেহই কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারে নাই।

শশধর তর্কচূড়ামণি

এই পণ্ডিত শাস্ত্র শিক্ষা দিতে কুমিল্লায় আসিয়াছিলেন, Theosophy মার্গাবলম্বীরা তাঁহাকে সেই জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে বিশেষ কলিকাতায় অনেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিশেষ "বঙ্গবাসী" তাঁহার গুণগান করিয়া বালকগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তিনি শিক্ষা দিতেন যে সকল দেশের ও সকল কালের শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে। কুশাসনে বসিলে শারীরিক বিদ্যুৎ উত্তমরূপে রক্ষিত হয়, প্রাণায়ামে বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যত রকম নিষেধ বা বিধি আমাদের শাস্ত্রে আছে তাহা সমস্তই মানবের মঙ্গলের জন্য। টিকি রাখা, গণ্ডূষ করা, উপবীত ধারণ ইত্যাদিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় হয়। তিনি আরও বলেন যে স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ পুরুষের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ বাক্য তিনি য়িহুদা শাস্ত্র মানিয়া নহে হিন্দুশাস্ত্রের কোন স্থানে পাইয়াছেন। এইরূপ তিনি অনেক অদ্ভুত বক্তৃতা করেন। সে সমস্ত এখানে বলা প্রয়োজন নাই।

বিদ্যুৎ ও আধ্যাত্মিকতা তাঁহার বক্তৃতার প্রধান স্থান অধিকার করে। বিদ্যুৎ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান যৎসামান্য, লোকের নিকট শুনিয়া দুই এক কথা শিখিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে

অবশ্য তাঁহার জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। তিনি একজন তান্ত্রিক, প্রশ্নে জানিলাম যে তিনি কালীর দশমূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিতে পান। ইহার কিছুই মানুষের কল্পনা নহে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বচনের উপর বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন সেই পরাশর বচনের অর্থ অন্যরূপ।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যবিধীয়তে।"

তিনি বলেন পতিতে পতৌর মধ্যে একটী লুপ্ত 'অ' কার আছে, ওটা পতিতে অপতৌ। অপতি অর্থে বাগ্‌দত্তা পতি। আমি প্রশ্ন করিলাম অপতি শব্দের এই অর্থ কি কোন অভিধানে আছে? উত্তর হইল অভিধানে নাই। না থাকিলে কি হয়, তাহা না হইলে অর্থ হয় না। নষ্টে অর্থে হারাইয়া যাওয়া। একদিন তাহার স্বামী যদি বাজারে যাইয়া পথ ভুলিয়া বাড়ী না আসিতে পারে তবে কি তাহার স্ত্রী মনে করিবে সে হারাইয়া গিয়াছে, অমনি একটা বিবাহ করিয়া বসিবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পণ্ডিতেরা কখনও সাধারণ লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করেন না। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ধৃষ্টতা অসম্ভব। তাঁহারা শাস্ত্রের বচন সহজ অর্থে করিয়া কোন বিধির প্রয়োজনীয়তা বা তাৎপর্য্য সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন না। সেরূপ করিবার চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে কখনও উদ্ভব হয় না। তাঁহারা কেবল এক শাস্ত্রের বচন অন্য শাস্ত্রের বচনের সঙ্গে ঐক্য বা অনৈক্য হইল সে সম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকেন ও

ঐ তর্কে যাহা প্রমাণিত হয় তাহাই সাব্যস্ত করেন। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বা আধুনিক সামাজিক বা নৈতিক নিয়মের বিপক্ষ বা স্বপক্ষ ও তদ্বারা এখন সমাজের মঙ্গল বা অমঙ্গল হইবে সে বিচার তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে নাই। এ অক্ষমতা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সরলপ্রকৃতি তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। তর্করত্ন মহাশয় সেই সনাতন পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া দিন কয়েক বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। Electricity, Magnetism, Spiritualism প্রভৃতি কয়টি কথা যেখানে সেখানে বুকনি লাগাইয়া বালকদলকে নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার বহুদিন পরে তাঁহার সহিত আর একবার ট্রেনে দেখা হয়। তখন তাঁহার নাম যশ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে।

যুক্তিযুক্তং বচো গ্রাহ্যমপি তু বালভাষিতম্।
যুক্তিহীনং বচঃ ত্যক্তমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।

এই মহাবাক্য পণ্ডিতগণের হৃদয়ে কখন স্থান পায় না, পাইলেও তাঁহারা যুক্তি অর্থে শাস্ত্রীয় যুক্তি বলিবেন, যদিও সে অর্থ এখানে শোভন হয় না।

কালক্রমে পুরাতন বটবৃক্ষ অনেক শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে, অনেক নূতন ঝোগ বা শিকড় নামাইয়াছে, পুরাতন গুঁড়ি বা পুরাতন শিকড় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন স্তম্ভসকল হইতে রস গ্রহণ করিতেছে। এখন পুরাতন শিকড় হইতে রস গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নহে। তাহা করিতে গেলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ এখনকার সমাজ ভিন্ন ভিন্ন

অংশে ও সম্প্রদায়ে পবিণত হইয়া পুরাকালেব গঠিত নিয়ম পরম্পরায় আবদ্ধ থাকিবে ইহা অসম্ভব ; পুবাতন গণ্ডী বহুকাল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এখন যিনি বলিবেন

যে নাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহা
গচ্ছন্ য তেন মার্গেন কদাপি নহি হীয়তে

তিনি মানব ইতিহাস অল্পই পড়িয়াছেন। পিতা পিতামহের পথ কি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রদর্শিত পথ? তাহা যদি হয় তবে সে বহুকাল ত্যক্ত হইয়াছে। সহস্র বৎসবের মধ্যে তো সে পথে লোক চলে নাই; কখনও ঐ পথে লোক বাস্তবিক চলিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণের ব্যবসা শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যাপন, পৌবোহিত্য, বাজসেবা ও ভিক্ষা। কিন্তু কৃষিকাৰ্য্য ও বাণিজ্য, ব্রাহ্মণেরা চিবকালই কবিয়া আসিতেছেন। যখন ঐ স্মৃতিশাস্ত্র প্রণোদিত হয়, তখনও ঐ সকল ব্যবসা ব্রাহ্মণদিগেব ছিল।

মৃচ্ছকটিক নাটক ও মুদ্রারাক্ষস নাটক অতি পুবাতন, খৃষ্টেব প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা। তাহাতে নায়ক চারুদত্ত ব্রাহ্মণ একজন ব্যবসাদার ধনী, শর্বিলক ব্রাহ্মণ একজন গুণ্ডা ও সিঁধেল চোর, বীট ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, মুদ্রাবাক্ষসের বাক্ষস ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রী একজন যোদ্ধা বীর, চাণক্য শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইয়াও রাজমন্ত্রী ও কূটতন্ত্র পরিচালক। চাণক্য ও রাক্ষস উভয়েই বিষ প্রয়োগে ও গুপ্ত চরদ্বাবা লোকেব প্রাণ হবণ কবিতে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের রাজনীতির প্রধান অঙ্গই গুপ্ত হত্যা। এই দুই পুরাতন নাটকে হিন্দু সমাজের যে অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা

নৈতিক হিসাবে উন্নতিশীল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ বিষয় নিশ্চয় যে সে সময়ে তান্ত্রিক অভিচার বা কুসংস্কার দেশে প্রচলিত হয় নাই। ভবভূতির সময় তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ দেশে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি নাটকে দেখা যায় সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তন্ত্রের নাম মাত্র নাই। মহাকবি কালিদাসের কোন গ্রন্থে তন্ত্রের গন্ধমাত্র পাওয়া যায় না। ভবভূতির সময়ে তন্ত্রের প্রতিপত্তি হইয়াছে দেখা যায়। তান্ত্রিক কদাচার ও সংস্কার পূর্ব্বোল্লিখিত দুই নাটকের প্রদর্শিত শিথিলবন্ধন অবনতোন্মুখ সমাজকে যে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। যদি ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর সামাজিক ইতিবৃত্ত কখনও আবিষ্কার হয় তখন দেখা যাইবে যে সমাজের কতদূর অধোগতি হইলে প্রাকৃতিক শাশ্বত নিয়মানুসারে আর স্বতঃ পুনরুদ্ধারের আশা তিরোহিত হয়। তখন পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিদেশীয় প্রভাবের অভ্যুত্থান আবশ্যক হয়।

এক্ষণে কুসংস্কার বিষয়ে দুই চার কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

কুসংস্কার

মানুষ মাত্রেই যখন জন্মে তখন শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। যেমন শরীরে বলাধান হইতে থাকে ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে সেই সঙ্গে মনের বলও বৃদ্ধি হয়। শারীরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনায় কতদূর নিজের প্রতি নির্ভর করিতে পারে তাহার একটী সীমানা সে একপ্রকার ক্রমে স্থির করিয়া লয়। মানসিক বল জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে বিকাশ হইবার কথা, হইয়াও থাকে, কিন্তু দেশ, সমাজ, সামাজিক, দৈহিক ও সাংসারিক অবস্থা ইহাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জন্ম জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে মানসিক বা নৈতিক বল সমকক্ষতা রাখিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন উষ্ণপ্রধান দেশে প্রকৃতি অনেক সময় ভীষণ আকার ধারণ করে। সেই বিভাষিকা সকল দেখিয়া মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সে কথা যে একেবারে মিথ্যা নহে তাহা যাঁহারা ১৮৯৭ সালে জুন মাসের ভূমিকম্পে ভুগিয়াছেন তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

রোগে শরীর ক্ষীণ হইলেও মনের বল অনেক কমিয়া যায় ইহা সকলেই প্রণিধান করিয়াছেন। আরব্ধ কার্য্যের বারম্বার নিষ্ফলতা ও মানসিক দৌর্ব্বল্য দুইয়ের কোনটি অল্প কারণ নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বা বলবৎ কারণ সাংসারিক দুর্ভাগ্য। প্রিয়

ব্যক্তির জন্য শোক, প্রিয়জনের রোগ বা মৃত্যু হইলে লোকে যত দুর্ব্বল হয় তত আর কিছুতেই হয় না। তারপর আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানচর্চ্চা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যখন জ্ঞান কম তখন মানসিক বলের অবশ্যই অভাব।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে দুর্ব্বল মন কাহাকে বলা যায়? যে ব্যক্তি নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না, সামান্য বিষয়েও অপরের পরামর্শের জন্য লালায়িত হয়, যে সকল কার্য্যে পাঁজি খুলিয়া দিনক্ষণ দেখে, হাঁচি, টিকটিকি, কাক, সর্প প্রভৃতি দেখিলে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয়, যে প্রতি বিষয়ে বিধি নিষেধ খুঁজিয়া বেড়ায়, যে ভূতপ্রেত অপদেবতার ভয়ে শশঙ্কিত হয়, যে প্রতি বিষয়ে যে কোন দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করে ও ঐ দেবতা প্রসন্ন বা রুষ্ট তাহা চিন্তা করে, তাহারাই দুর্ব্বলচিত্ত। অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, আর ইহার সকল লক্ষণ যে প্রতি দুর্ব্বলচিত্তে প্রকাশ হইবে তাহাও নহে। এইগুলি প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা প্রায়ই কুসংস্কারাবিষ্ট।

যদি আমাদের দেশের লোক সুস্থকায় হইত, ম্যালেরিয়া প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দেশ হইতে তিরোহিত হইত অকালমৃত্যু কমিয়া যাইত, তাহা হইলে দেশের অনেক কুসংস্কার অদৃশ্য হইত। অনেক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কুসংস্কার হইতে মুক্তি পাইত। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত না

হওয়াতে তাহারা স্বশিক্ষিত স্বামীদিগকে দুর্ব্বলচিত্ত ও কুসংস্কাবাপন্ন করিয়া ফেলে। প্রিয় সন্তান বিয়োগে স্ত্রীলোক মাত্রই কত দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া পড়ে সকলেই জানেন। ভূত প্রেত দেবতা দানব ক্রুদ্ধ হইয়া সন্তানের অকল্যাণ করে এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহারা নানা প্রকার পূজা পার্ব্বণ, ব্রত নিয়ম, মানত, আচার, উপবাস প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হয় ও নিজ স্বামীকেও সেই পথে আকর্ষণ করে। পুরুষও সন্তানের রোগ হইলে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন যে কোন উপায়ে সন্তানের জীবন রক্ষা তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ও ধ্যান হইয়া উঠে। সেরূপ অবস্থায় তিনিও যে সহধর্ম্মিণীর প্রদর্শিত উপায় ও প্রক্রিয়া ভক্তির চক্ষে দেখিবেন ইহা স্বাভাবিক। এইরূপে মনের বল একবার হারাইলে আর পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তখন দুর্ব্বল মন একটা আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়। যখন সম্পূর্ণ সুখী নিরাপদ-গ্রস্ত লোক দেশে দুর্ল্লভ তখন আশ্রয় সকলেরই প্রয়োজন। যে আশ্রয় পাইলে মনে শান্তি হয়, ভয় দূরীভূত হয় সেই আশ্রয় সকলেরই প্রয়োজন। ধর্ম্ম মনুষ্যের সেই আশ্রয়। লোকে বিপদে পড়িলে ধর্ম্মে শরণ লয়। আমাদের দেশে নানা দেবতা, অপদেবতা পূজিত হইয়া আসিতেছে, যোগ, তন্ত্র, উপনিষদ— অনেককে আশ্রয় দেয়। গুরু, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, অবধূত প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টারও অভাব নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি বা অধিকার অনুসারে ইহার মধ্যে কোনটী বাছিয়া লইবেন ও লইয়াও থাকেন। অধিক সংখ্যক লোকের নিজের

বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা অপরের অভিমত অনুসারে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অবশ্য মহাজ্ঞানীরা বলিবেন নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসের সামঞ্জস্য রাখিয়া যে ধর্ম্ম মনের উপর অধিকার বিস্তার করে সেই ধর্ম্মই চিরমঙ্গলপ্রদ হয়। কেবল ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ। পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বোঝা যায় যে ভয় হইতে পূজার উৎপত্তি। সকল দেবতাই প্রথমে ভয়ের কারণ ছিলেন। পরে কালক্রমে তাঁহাদিগের অদ্ভুত ও হৃদয়গ্রাহী মহিমাসকল আবিষ্কৃত হইয়া তাঁহারা ভক্তির পাত্র হইয়া উঠেন। জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম হইতে ভয়ের ভাব ক্রমে অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভয়ের পাত্র মনে করিয়া ভগবান বা ভগবতীর পূজা বা আরাধনা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ। ভগবানের শক্তি অসীম, গুণও অসীম। তাঁহার অসংখ্য বিভূতির মধ্যে যে কোন বিভূতি স্বীকার করিয়া আমরা সাকার দেবদেবারূপে আরাধনা করিতে পারি এবং তাহাতেই আমরা আশ্রয় পাইতে পারি ও ভক্তিনম্র মস্তকে প্রণত হইতে পারি। তাহাতে মন নির্ম্মল ও সানন্দ হয়। কিন্তু চিন্তা করিলে ধ্বংসকারী ও অনিষ্টকারী বিভূতি অনেক বোঝা যায়। কাল সমস্তই ধ্বংস ও লোপ করে, অসংখ্য রোগ সর্ব্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ বিপ্লব সমস্তই ভগবানের নিয়মে হইয়া থাকে। উপাসনাস্থলে সে

সকল কথা মন হইতে দূরে রাখাই মঙ্গল। উহা মনে রাখিলে মন নির্ম্মলও হয় না, সানন্দও হয় না। সে সকল বিভুতির পূজা অবনতি ও ধ্বংসের মার্গে লইয়া যায়।

কুমিল্লায় পরিবারগণ অল্পদিন ছিল, এক বৎসর হইবে। দ্বিতীয় কন্যা উষার বয়ঃক্রম প্রায় ১২ বৎসর তাহার বিবাহ দিতে হইবে। ১৮৯৭ সালে এপ্রিল মাসের প্রথমে তাহাদিগকে কৃষ্ণনগর গৃহে প্রেরণ করা হইল। আমি একা থাকিতাম, একমাত্র ভৃত্য ছিল, সেও দুরাচার।

পুত্রের বিবাহ

অল্পদিন পরে দাদার পত্রে জানিলাম প্রথম পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ এক প্রকার স্থির হইয়াছে। আমি এতদিন পুত্রের বিবাহ বিষয়ে কিছুই ভাবি নাই। তাহার বয়স ২২ বৎসর হইয়াছে। অদ্যাপি B. A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় নাই। কোন ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া কিছু উপায় করিলে বিবাহ দিব এইরূপই মনে মনে সিদ্ধান্ত ছিল। হঠাৎ এরূপ প্রস্তাব শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। যদি পুত্রের বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমার বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য। তাহার অভিপ্রায় জানিবারও উপায় নাই। গৃহিণীকে লিখিলে তিনি আমার অভিপ্রায় পুত্রকে জানাইবেন। ইতস্ততঃ ভাবিয়া দাদাকে

উত্তর লিখিলাম যে পুত্র B. A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হইলে তাহার বিবাহ এখন দেওয়া হইবে না, ও সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না। মে মাসে একদিন গেজেটে দেখিলাম সুরেন ও নরেন দুইজনই B. A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন কাছারিতে একা বসিয়াছিলাম, আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। আশ্চর্য্য যে কোন দুঃখে বা শোকে আমার চক্ষে জল আসে না। বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলে আমার আঁখি শুষ্ক থাকে না। পরীক্ষার ফল দেখিয়া দাদা উৎসাহ পাইলেন ও একেবারে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ১৫ই জুন বিবাহ হইবে। আমি এক সপ্তাহের অবসর লইয়া ১০ই জুন কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলাম।

১২ই জুন, ১৮৯৭ ভয়ানক ভূমিকম্প। গৃহে অনেক বালক বালিকার সমাগম হইয়াছে সকলকে গৃহে হইতে বাহির হইতে বলিয়া দাদার গৃহে গেলাম, সেখানে চিৎকার করিয়া, সকলকে নীচে প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইতে বলিয়া ফের নিজগৃহে গেলাম। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া দাদার গৃহে চিৎকার করিয়াছিলাম সেইখানে একটা উচ্চ প্রাচীর ছিল, আমি যেমন ফিরিলাম ঐ প্রাচীর তখনই ভূমিসাৎ হইল। নিজ গৃহে আসিয়া দেখি সকলে বাগানে গিয়াছে। বালক বালিকাগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে। প্রথমে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি শোনা গিয়াছিল, এখন সে সব নিস্তব্ধ, একটা দুকদুক শব্দ, বাতাস ধুলাময় ও চতুর্দ্দিকে হাহাকার। দাঁড়াইয়া থাকা

অপেক্ষা বসাই ভাল মনে করিলাম। ৪।৫ মিনিট কাল এই অবস্থায় থাকিয়া মাতা বসুন্ধরা স্থির হইলেন। সকলেই ভয়ে কম্পমান্, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সশঙ্কিত, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প কম্প অনুভব হইতেছে। আর সকলে ঘর হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে, আমার নিজগৃহে কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু অপর অপর অনেক গৃহ জখম বা ধ্বংস হইয়াছিল। ১৫ই জুন বিবাহ দিতে কোন্নগর গেলাম। বিবাহে আমার ১৪০০৲ টাকা খরচ হয়। কন্যাপক্ষ হইতে ৫০০৲ টাকা মাত্র পাই।

এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পরেও ২০ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প কম্প সময়ে সময়ে অনুভূত হইত। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে অধিক ক্ষতি করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা গাঁথনির গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য ইট ও কাদার গাঁথনি দাঁত বাহির করা স্বল্প মূল্যের গৃহগুলি খাড়া ছিল। এরূপ ভূমিকম্প বোধ হয় ১০০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই, হইলে অবশ্যই কিম্বদন্তি থাকিত। কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে পাকা গাঁথনি অতিঅল্পই ছিল। মুসলমান গভর্ণমেণ্টের সময় কেহ পাকা গাঁথনি প্রস্তুত করিতে পারিত না। করিতে হইলে রাজ অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কুমিল্লায় রাজ অট্টালিকা ভিন্ন একটিও পাকা দালান নাই। রাজ অনুমতি ভিন্ন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ। রাজার ম্যানেজার একজন ভূতপূর্ব্ব Civilian, তাঁহারও অনুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রতি বৎসর আগুণ লাগিয়া

কুমিল্লায় শত শত গৃহ দাহ হইয়া যাইত। কুমিল্লার ন্যায় বাঙ্গালা দেশের অবস্থা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই এইরূপ ছিল। ব্রিটিশ বাজ অট্টালিকা গাঁথিতে কোন আপত্তি না কবিলেও পুবাতন অভ্যাস বশতঃ লোকে কাঁচা ঘরেই বাস করিত ও অগ্নিদাহে মধ্যে মধ্যে হাহাকাব করিত।

কুমিল্লায় একা ফিরিয়া আসিলাম। কুমিল্লায় যাইতে ও আসিতে প্রায় একদিন একরাত্রি লাগে। আহারাদির জন্য কোন বন্দোবস্ত প্রায় সঙ্গে থাকিত না। গোয়ালন্দ অথবা চাঁদপুর হোটেলে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের চালা দোকান ঘরে) বন্দোবস্ত করিতাম। নূতন হাঁড়িতে শুদ্ধ ভাত ও আলু ভাতে আর মাখন। কখন কখন ইলিশ মাছ ভাজা। ইহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য ইচ্ছা পূর্ব্বক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মিশাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ডাল, ঝোল দোকানে প্রায়ই ময়লা বা অপরিষ্কাব পাত্রে ঢালা হয়। রান্নাও অপরিচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহাদের জল কখনও পান করি নাই। সোডা ওয়াটার বা লেমনেড্ দ্বাবা পান কার্য্য হইত। তাহা অভাবে Railway station এর filtered water.

কুমিল্লার ভাষা প্রথম প্রথম বুঝিতে বিলম্ব হইত। বিশেষ স্ত্রীলোকদের কথা ত সহজে বুঝিতাম না। দোভাষী প্রয়োজন হইত। অর্থাৎ মোক্তার বা আমলা কেহ বুঝাইয়া দিত। হাইকোর্টস্থানে সাইকোর্ট, সকলের স্থানে হকল। নাল্লা মানে পাট (Jute), মুহ্—মুখ।

হিন্দুরা বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে কালীপূজা দিয়া খাসা বলি দেয় ও নিমন্ত্রণ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে ভোজ দেয়। মধ্যদেশ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পর্দ্দা অধিক কঠোর। গরীব লোকের পরিবারেরাও পর পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় না। সেখানকার সরকারি উকিল তাঁহার পুত্রের বিবাহে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। মে মাসের অত্যন্ত গরম দিন, দ্বিপ্রহরের সময় মাংস পোলাও খাইতে আমি অস্বীকার করি ও রৌদ্রে এক মাইল হাঁটিয়া যাইতে আমি নারাজ—সেখানে গাড়ীও পাওয়া যাইত না। কাজেই আমি অসামাজিক হইলাম। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া ১২ টার সময় কাছারি বন্ধ করাইয়া দিলেন, কারণ আমলা, মোক্তার, হাকিম সকলেই নিমন্ত্রিত।

একবার গ্রীষ্মকালে বদমাইস লোক রাত্রে ঘরে আগুন দিতে আরম্ভ করিল। অনেক গৃহ জ্বালাইয়া দিল। আমরা পাড়ায় দল বাঁধিয়া রাত্রে পাহারা দিয়া ফিরিতাম। সে এক আমোদ!

মিঃ এফ, এইচ, স্ক্রীন Offg. Commissioner.

স্ক্রীন সাহেব অত্যন্ত জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। তিনি আসিলে ঢাক, ঢোল, নিশান, গানবাজনা, নাচখেলা, দৌড়, মল্লযুদ্ধ, থিয়েটার সমস্ত হওয়া আবশ্যক। শশীবাবু Engineer এই সব কার্য্যে একজন ওস্তাদ, তিনি সাহেবের প্রিয় হইয়া

উঠিলেন। আমরা কেহই এই কার্য্যে যোগ দিতাম না। এজন্য সাহেব ভারী খাপ্পা। একদিন তিনি সকালে অফিস পরিদর্শন করিবেন। আমরা সকালে কাছারি গিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট কেনেডি সাহেব, আমি ও আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রাস্তায় পায়চারি করিতেছি। স্ক্রীন সাহেব অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আমাদের দেখিয়া নামিয়াই আমাদের দুইজনকে বকিতে আরম্ভ কবিলেন, আমরা এই সব কার্য্যে কেন যোগ দিই না, আমরা তিনজন কোন উত্তব কবিলাম না, তিনি অনর্গল বকিলেন। পবিদর্শন ত কিছুই হইল না। সেদিন বেলা ৩টার সময় বালকদিগের খেলা হইবে। আমি সভাস্থলে পৌঁছিয়া দেখি সেখানে শশীবাবু ভিন্ন ভদ্রলোক কেহই আসেন নাই, কতকগুলি বালক মাত্র।

স্ক্রীন সাহেব ও তাঁহাব মেম আসিলেন। সভা জনশূন্য দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া দুইচার লাফ, আমার সঙ্গে আমাব এক কন্যা ছিল, সে ভয়ে কাঁদিযা উঠিল। ক্রমে অপর লোক অনেক আসিল, সাহেব ঠাণ্ডা হইলেন।

১৮৯৮ সালে ১৭ই জুন দুই মাসেব বিদায় লইয়া কুমিল্লা ত্যাগ করিলাম। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ প্রধান উদ্দেশ্য।

২৩শে জুলাই বিবাহ কার্য্য শেষ হইল। বব বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া Medical College এ প্রবেশ করিয়াছেন। বিবাহে ৪০০০৲ হাজার টাকাব অধিক খরচ হইল। পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পরে কিছু বলা যাইবে।

ঢাকা

(২৬ আগষ্ট '৯৮—৩ সেপ্টেম্বর '৯৯)

ঢাকায় এক বৎসর মাত্র ছিলাম। ইহার মধ্যে পরিবারগণ কেবল ৪ মাস সেখানে ছিলেন। প্রথমে যাইয়া গৃহের জন্য কষ্ট হইয়াছিল, পরে নবাবপুরে একটি ভাল দ্বিতল গৃহ পাইয়াছিলাম। সহর বৃহৎ, কিন্তু অতি অপরিস্কার। খাদ্যদ্রব্য সকল প্রকার সুলভ, মৎস্য খুব সস্তা, দুগ্ধের দ্রব্য, তরকারি, ফল যথেষ্ট প্রাপ্তব্য। এইজন্য এ প্রদেশের লোক ঢাকা অতি প্রিয় স্থান মনে করে। কিন্তু আহার্য্য দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত হইলে কি হয়, উদর সর্ব্বদাই এখানে অপটু, আহার করে কে? সকলেরই অগ্নি-মান্দ্য বা Dyspepsia, এখানে ক্ষুধা প্রায়ই তেজস্কর হয় না।

ছোট বালকদিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম, ২।৪ দিন পরে নাম কাটাইয়া গৃহে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলাম। এমন ভয়ঙ্কর স্কুল কুত্রাপি নাই। শিক্ষকগণ বালকদিগকে যেমন পাঠ দেয় তাহা দিলে ২০ ঘণ্টা খাটিলে কুলাইয়া উঠে না, বালকদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পড়া মুখস্থের যন্ত্র করিয়া তোলে।

ঢাকার নবাবের বাটী ও বাগানগুলি সুন্দর, কোন কোন উদ্যানে সাধারণের প্রবেশ ছিল। এখানকার শ্বেতাঙ্গগণ কিছু অধিক অহঙ্কৃত বোধ হইত, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিতেন না।

এক মোকদ্দমায় এক ফকিরের সাক্ষ্য নিতে তাহার গৃহে যাইতে হইয়াছিল। সে গৃহই তাহার গদি, সে গৃহাঙ্গনের চতুঃসীমার বাহির হইতে পায় না। তাহার পরিবার আছে, এক পুত্র স্কুলে পড়ে। তাহার আশ্রমের কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। ঐ সম্পত্তি হইতে তাহার আয় হয়। সে যুবাপুরুষ, ফকির বা সন্ন্যাসীর কোন ভাব তাহাতে প্রকাশ নাই, তবে সে গৃহাঙ্গনে আবদ্ধ এই পর্য্যন্ত।

মুসলমান স্ত্রীলোক কেহ কেহ আবা মুড়ি দিয়া বাহিরে যায়, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত, কেবল চক্ষের কাছে দুইটী ফুটা আছে তাহাদ্বারা দেখিতে পায়। একটি স্ত্রালোক ঐ অবস্থায় সাক্ষ্য দিতে আদালতে আসিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম ভুতের সাক্ষ্য নেওয়া যাইতে পারে না। যদি আবা খুলিয়া সাক্ষ্য দেয় তবে গ্রহণ করিব। তখন সে সম্মত হইয়া আবা খুলিল, সে যুবতীও নহে, সুন্দরীও নহে।

হিন্দু স্ত্রীলোকেরা সকলেই বাহিরে যায় ও পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। আমি তাঁতি পল্লাতে বাস কারতাম। বিকালে প্রত্যহ মহিলাগণ সদর রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। অবগুণ্ঠনাবৃত প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, যুবতী সকলেই গমনাগমন করিতেছে। কিন্তু বস্ত্র গুটাইয়া পৃষ্ঠে মাথার কাছে জমাইত একটি বোচকা। আমার নিকট এরূপ পোষাক কুৎসিৎ বোধ হইত।

বিবাহে ইহারা যথেষ্ট সজ্জা করিয়া থাকে। ঢাকার তাঁতিকুল চিরকাল সঙ্গতিপন্ন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার বস্ত্র

ইউরোপে যাইত, পল্লী দেখিলেই বোধ হয় ইহারা পূর্ব্বে যথেষ্ট ধনী ছিল। কিন্তু বিগত ৫০।৬০ বৎসব ম্যানচেষ্টার ইহাদিগের অবস্থা ক্রমে হীন করিয়া আনিতেছে।

বিবাহে বর দুইবার সজ্জা করিয়া শ্বশুরালয়ে যায়। একবার অশ্বপৃষ্ঠে, আর একবার বৃহৎ ও উচ্চ মন্দিরের ন্যায় সজ্জিত নরযানে। বিবাহের পর যখন ফিরিয়া আসে তখন অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত একটি সুসজ্জিত খট্টা থাকা চাই। ঐ খট্টা পাতলা রঙ্গিন মশারিদ্বারা আবৃত, ভিতরে বিছানার উপর বহুমূল্য দ্রব্যাদিও সাজান থাকে। দবিদ্র লোকের বিবাহেও ঐরূপ সজ্জিত খট্টা থাকে, কিন্তু উপরেব রঙের বস্ত্রাদি খুলিয়া লইলে দেখা যায় ভিতরে বাঁশের বাখাবিদ্বাবা নিৰ্ম্মিত খট্টাকার মাচা ভিন্ন আব কিছুই নহে। প্রতি বিবাহের সময় ও বিবাহের পর বব প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে স্ত্রীলোকদিগেব গানের ধূম পড়িয়া যায়। বিবাহ রাত্রেও বর যতক্ষণ কন্যাগৃহে থাকে ততক্ষণ গানের বিরাম নাই। দ্বিরাগমনেব সময়ও ২।৩ দিন ক্রমাগত গান চলিতে থাকে। যুবতী স্ত্রালোকেরাই গান করে। অগ্রহায়ণ মাঘ ও বৈশাখ মাসে দিনবাত্রি সুললিত গান আমার গৃহে বসিয়াই শুনিতে পাইতাম। গানের সমস্ত চরণ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর না হইলেও বুঝিতাম যে সমস্তই প্রণয় সঙ্গীত।

এই সঙ্গীত আমার হৃদয়গ্রাহী বোধ হইত। ইহা উচ্চ অঙ্গের **highly sentimental** নিধুবাবুর টপ্পাও নহে, গ্রাম্য অশ্লীলতাদুষ্ট কবিরগানও নহে। কিন্তু গানগুলিব সকল

চরণ উদ্ধার করিতে পারিতাম না বলিয়া ক্ষোভ থাকিত। একটা গানের কয়টী কথা এই—

আহা বেশ বেশ,
খুব ভাল দেখা যায়!
আদর ক'রে কোলে ক'রে মুখটি পোঁছায়।

যুবতী হাততালি দিয়া এই গান যখন গাইতে থাকে তখন কর্ণ সুধারসে পূর্ণ হয়।

এক তাঁতি বন্ধুকে প্রার্থনা জানাইলাম যে কয়েকটী গান আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বীকার করিয়া বলিলেন উহারা শ্যামা বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলন সম্বন্ধে অনেক গান জানে, আপনাকে লিখিয়া দিব। ইহা শুনিয়া আমার আগ্রহ তিরোহিত হইল। আমি যাত্রাদলের গানের জন্য লালায়িত নহি।

জন্মাষ্টমার মিছিল বা শোভাযাত্রা ঢাকার এক বিশেষত্ব। রাস ও ঝুলনেও যথেষ্ট সমারোহ হয়। তাঁতিকুল প্রায়ই বৈষ্ণব। প্রায় সকলের ঘরে বিগ্রহ আছে। প্রত্যহ বিগ্রহের ভোগ দিয়া তবে গৃহস্থ আহার করেন। এই রীতি অতি সুন্দর। গৃহের স্ত্রীলোকেরা পবিত্র হইয়া দেবতার জন্য রশুই করেন, অবশ্য সমস্তই ভক্তিভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। জ্ঞাতসারে কোন প্রকার অপবিত্র বা দূষিত দ্রব্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। দেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে এই পবিত্র খাদ্য নিজেরা আহার করে। দুঃখের বিষয় পৌত্তলিকতার সঙ্গে

এই ক্ষেমঙ্কর রীতি লোপ পাইতেছে। কেহ যদি পৌত্তলিকতা বাদ দিয়া এই সুন্দর রীতি বজায় রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তিনি এ দেশের মহৎ উপকার সাধন করিতে পারিবেন। আমাদের প্রধান খাদ্য অন্ন, তাহাকে সুস্বাদযুক্ত করিতে নানা প্রকার শাক সব্‌জী প্রয়োজন, সকল দ্রব্য সদ্য পক্ক না হইলে প্রীতিকর হয় না, স্বাস্থ্যদায়কও নহে। স্বগৃহে পক্ক হওয়া চাই, সুসিদ্ধ হওয়া চাই। বেতনভোগী ভৃত্য দ্বারা প্রস্তুত ডাল, ভাত প্রায়ই সুসিদ্ধ বা সুপক্ক হয় না, হইলেও পরিষ্কার ও পবিত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকাতে তৃপ্তিকর তেমন হয় না। অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে গৃহিনাদিগের আর রন্ধনে প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্য বলিতেছি দেবতার ভোগের জন্য রন্ধন প্রথা অতি শুভকর। আমাদের খাদ্য সাধারণতঃ যে প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহাতে কীটপতঙ্গ, পিপীলিকা, মশা মাছি, সহজেই মিশ্রিত হইতে পারে। মাটী, ঝুল, কয়লা, ছাই, চুন প্রভৃতি অনেক সময় প্রবেশ করে। ডাইলে, মশল্লায় নানা প্রকার শস্য, খাদ্য ও অখাদ্য, ভেজাল থাকে। এই সমস্ত আপদ মনে রাখিয়া নির্দ্দোষ বস্তুই করা বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দেবতার জন্য বস্তুই মনে করিয়া গৃহিনীরা যত যত্নে সাবধান হইবার চেষ্টা করেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক শস্য তন্ন তন্ন করিয়া বাছিয়া ল'ন, কোন খাদ্যদ্রব্য বাছিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার না হইলে রান্না ঘরে যাইতে পায় না।

আমাদের দেশে উদরাময়ের যে এত প্রাদুর্ভাব তাহার এক প্রধান কারণ বেতনভোগী ভৃত্যের রসুই আহার নহে কি? আমাদের সকল খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য ডাইল, তাহা সুসিদ্ধ না হইলে কেবল বৃথা আহার হয় এমন নহে, উদরাময় উৎপাদন করে। এই জন্যই বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে পরামর্শ দিয়াছেন যে ডাইল ছাঁকিয়া খাইবে।

যশোহর

(সেপ্টেম্বর '৯৯—১৯০২ মার্চ্চ)

সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ আদেশ হইল আমি যশোহর বদলি হইয়াছি। এ কার্য্যটি একজন ঢাকাবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যিনি যশোহরে ছিলেন তাঁহারই চক্রান্ত। তিনি ঢাকায় আসিতে ব্যগ্র, ঢাকা নিবাসী অফিসারগণ ঢাকায় আসিতে সকলেই ব্যগ্র, এজন্য তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিলেন। যশোহর আমার জন্মস্থান ও আমার অনেক আত্মীয় কুটুম্বের বাসস্থান, কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে কদর্য্য, এজন্য যশোহরে ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহই আসিতে চায় না। প্রায় তিন বৎসর যশোহরে ছিলাম, অনেকবার জ্বরে ভুগিয়াছি। গৃহিনী ও সন্তানগণ সর্ব্বদাই পীড়িত হইতেন। পানীয় জলের অভাব, ভৃত্য অতি বিরল ও দুস্প্রাপ্য। দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য, মৎস্য স্বল্পপ্রাপ্য, সুখের মধ্যে

আত্মীয় স্বজন অনেক পাইলাম। ১৯০২ মার্চ্চ মাসে census হইল, তাহার ভার ইচ্ছাপূর্ব্বক লইয়াছিলাম।

এখানে এক নেশার কথা বলিব। গুড়ুক সেবন। ৭।৮ বৎসর বয়সে যখন কর্ত্তৃপক্ষরা তামাক সাজিতে বলিতেন, সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে তামাক খাইতাম। গুরুজন কেহ জানিতে না পারেন এজন্য সাবধান হইতাম। এজন্য মধ্যে মধ্যে ত্যাগ করিতেও হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে থাকিলে পাঠ্যাবস্থায় প্রায়ই ত্যাগ হইত। ২।৩ বৎসর ত্যাগ করিয়া আবার সুবিধা পাইলেই ধরিতাম, যখন কলেজে পড়ি তখন অভ্যাস হইয়া গেল। যখন ৩১ বৎসর বয়স তখন কাসি রোগের জন্য ত্যাগ করিলাম, ৫ বৎসর খাই নাই। পরে দন্তশূল আরম্ভ হইলে অনেকের পরামর্শে cigarette ও চুরট ধরিলাম। জ্বর হইলে তামাক সহ্য করিতে পারিনা। চুরট ছাড়িয়া আবার তামাক ধরিলাম, দুই বৎসর পরে আবার তামাক ছাড়িয়া চুরট ধরিলাম। এখন কাসির ব্যাধি হইলে মধ্যে মধ্যে ত্যাগ করি। তাহা না হইলে গুড়ুক সেবন অত্যাজ্য হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৭৬ সালে চা পান আরম্ভ করি। তখন আসাম চা দেশে উঠে নাই। চীন দেশীয় চা দেশে চলতি ছিল। সর্ব্বদা শ্লেষ্মার পীড়ার জন্যই প্রথম এই অভ্যাস করিয়াছিলাম। ১৮৮৭ সালে গয়ায় প্রথম হাঁপানির সূত্রপাত হয়, তখন দেখিলাম গরমের সময় চা পান করিয়া এই ব্যাধি আনিয়াছি। সেই অবধি গ্রীষ্ম কালে প্রায়ই ইহা ত্যাগ করিতাম, কিন্তু একেবারে ছাড়িতে পারি নাই।

১৯১১ সালে শীত কালে প্রথম হাঁপানি রোগ হইয়া ৬ মাস ভুগী, তারপরে আর তিন বৎসর শীতকালে ঐ ব্যাবাম হয়, গ্রীষ্মের প্রাবল্য হইলে ভাল হই। ১৯১৪ সালে চা একেবারে ত্যাগ করিলাম, সেই অবধি ঐ ব্যাধি আর হয় নাই। ইতি নেশা তত্ত্ব। তবে পান খাওয়াকে যদি নেশা বল, সে নেশা বাল্যকাল অবধি ছিল। দাঁত গেলেও কিছু দিন ছেঁচা পান ব্যবহার করিয়াছি। পরে ৬০ বৎসর বয়সে একেবারে ত্যাগ করিয়াছি।

গরু কাটার মোকদ্দমা

মুসলমানেরা গরু খায়, সাধারণ মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে ঈদের সময় গরু কাটিয়া মাংস খাওয়া পুণ্যের কার্য্য। হিন্দুরা গো-হত্যার বিরোধী। কেবল বিরোধী বলিলে যথেষ্ট হয় না, তাহারা গো হত্যা হইয়াছে শুনিলে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। .ইহার কারণ, খুঁজিয়া পাই না। বৈদিক সময়ে গরু কাটিয়া ঋষিরা মাংসাহার করিতেন। ঋগ্‌বেদে ইহার প্রমাণ আছে। ভবভূতি তাঁহার উত্তর রাম চরিতে ও বীর চরিতে ইহা প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু মুচি ও চামাররাও গো মাংস খাইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ও পৌরাণিক শাস্ত্র অনুসারে গো-হত্যা মহাপাতকের মধ্যে গণ্য, কেন ও কিরূপে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল তাহার কারণ পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধ রাজগণ বলি নিষেধ করিয়াছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ রাজা জীবহত্যাও

নিষেধ করেন, ও গো হত্যা বিশেষরূপে দুষ্কার্য্য বলিয়া সে সময় পরিগণিত হয়। আরও আশ্চর্য্য এই যে প্রতিভাশালী গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র গোহত্যা সমাজবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ইহা অতি নিন্দনীয় বলিয়াছেন। এই সামান্য বিষয় লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এত মনোমালিন্য কখনই দেশের পক্ষে শুভ নহে। এ দেশ যে স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত অদ্যাপি হয় নাই তাহার এক নিদর্শন এই বিবাদ। হিন্দুদের এতদূর উত্তেজনার কারণ যে কোন রাষ্ট্রীয় সভায় ইহা বিচার্য্য বিষয় হইলে হিন্দু-মুসলমান কখনও একমত হইতে পারে না। যদি কতকগুলি বিলাতফেরতা উচ্চমনা হিন্দু সে সভায় যোগ না দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিদ্বেষানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

বৃটিশাধিকৃত ভারতে এ বিষয়ে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই আদালতে বিচারকর্ত্তারা গরু কাটিলে মুসলমানদিগকে অপরাধী করিতে পারেন না। এ দিকে গো-হত্যা করিলে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। যে সকল গ্রামে হিন্দুরা অধিক ও বর্দ্ধিষ্ণু সে গ্রামে মুসলমানেরা ইচ্ছা থাকিলেও এ কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। আবার গ্রামের জমিদার হিন্দু হইলে মুসলমান প্রজারা অনেক স্থানে এ কার্য্যে বিরত থাকে। কিন্তু সর্ব্বদা মুসলমানরা হিন্দুর শঙ্কায় যে নিজেদের ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিতে বিরত থাকিবে এ আশা করা যায় না।

যশোহরে থাকিতে ২।৩টা এইরূপ মোকদ্দমা আমার হাতে

আসে। সকলগুলিতেই হিন্দুরা মুসলমানগণকে এই অপরাধে নির্য্যাতন ক'রয়াছিল। দুইটি মোকদ্দমা হিন্দুদিগকে নানা বিভীষিকা দেখাইয়া মিটাইয়া দিলাম। কারণ, দেখা গেল প্রমাণ লইয়া আসামীকে সাজা দেওয়া সহজ নহে। আসামী অনেক এবং কার্য্য ও প্রচ্ছন্ন ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, যখন গ্রামে অপক্ষপাতী কহ নাই তখন বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। কিন্তু একটি মোকদ্দমা মিটাইতে পারিলাম না। এক হিন্দু জমিদারের গ্রামে মুসলমানগণ গোহত্যা করিয়াছে। জমিদারের গোমস্তা মুসলমান ঐ গ্রামবাসী এবং গ্রামের মাতব্বর লোক। আর একটী মুসলমান যুবক ঐ গোমস্তার অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিল। গোমস্তা জমিদারকে সংবাদ দিল ঐ যুবক অগ্রগামী হইয়া গোহত্যা করিয়াছে ও সকলকে মাংস বণ্টন করিয়া দিয়াছে।

ঐ যুবক আসিয়া নালিশ উত্থাপন করিল যে জমিদারের পেয়াদা একদিন সকালে তাহাকে জমিদারের গৃহে লইয়া গেল। জমিদার অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি গোহত্যা করিয়াছ ও তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই একখানি যষ্ঠি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সে যুবক দুই এক ঘা আঘাত খাইয়া পিছু হটিতে পড়িয়া গেল, ও জমিদার তাহার বুকের উপর বসিয়া এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন শূকরের চর্ব্বি লইয়া আইস। সে ব্যক্তি একটা ঘটে করিয়া কোন বস্তু কাঠিতে ঝুলাইয়া আনিল। হুকুম হইল যে উহা যুবকের মুখে

ঢালিয়া দাও, তাহাই করা হইল। পরে উহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। যুবক আরও বলিল যে গোহত্যা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নিজে গ্রামের নগণ্য ব্যক্তি, গোমস্তাই গ্রামেব মণ্ডল, সেই ও কার্য্য করিয়া বিদ্বেষবশতঃ তাহার নাম করিয়াছে। প্রশ্নে জানিলাম জমিদারের সহিত তাহার কিছু মাত্র বিবাদ ছিল না। আমার প্রশ্নে সে আরও বলিল যে ইহাতে তাহার আর কোন ক্ষতি হয় নাই, সামান্য আক্রমণে ও আঘাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি বা অপমান হয় নাই, তবে গ্রামের লোকে শূকরের চর্ব্বি খাইয়াছে বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে ইহাই তাহার দুঃখ। আমি জমিদারের মোক্তারকে বলিলাম যে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেল। যুবক বলিল ২০০৲ টাকা খরচ করিতে পারিলে সে গ্রামের লোককে ভোজ দিয়া সমাজে উঠিতে পারে, ঐ টাকা উহাকে দিলেই মোকদ্দমা মিটিয়া যাইবে। মোক্তার প্রতিপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া বলিলেন যে টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইলে তাঁহার প্রজার নিকট হীন হইতে হইবে। তাহাতে তিনি রাজী নহেন। পরে মোকদ্দমা হইল, জমিদারের কয়েদ ও জরিমানা হইল। আপিলে সাজা কিছু কমিল বটে, কিন্তু জমিদারের ৩০০০৲ টাকা খরচ ও কয়েকদিন জেলে থাকিতে হইয়াছিল। বাদীও ২০০৲ টাকা পাইল।

অল্প দণ্ড দিতাম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার এক বদনাম ছিল, কিন্তু আমি কখনও চুরি, ডাকাতি বা নিষ্ঠুরতায় অল্প সাজা দিই নাই। অন্যান্য অপরাধে বিশেষ ভদ্র বংশের

বালক ও যুবকদিগকে জেলে পাঠাইতে আমি সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক। কুমিল্লায় এক ব্রাহ্মণ বালক পোষ্টমাষ্টারের বাক্স হইতে কতকগুলি ডাকটিকিট চুরি করিয়াছিল, তাহাকে কেবল জরিমানা করিয়াছিলাম। আর যশোহরে এক কায়স্থ বালক বা যুবক গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টার ছিল, সে Income tax এর assessor সাজিয়া এক গ্রামে যাইয়া Income tax ধার্য্য করে, ও টাকা দাবী করে। তাহাকে কেহ টাকা দেয় নাই, উপরন্তু এক ব্যক্তি ঐ সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে দেওয়াতে Post Master অভিযুক্ত হয়। তাহাকেও জেলে দিই নাই। এইটা আমার গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কিছু দিন ঘুরিলেই তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হয় ইহাই আমার বিশ্বাস। তারপরে ১০৲ টাকা মাহিনার চাকরের পক্ষে ৫০৲ টাকা জরিমানা যে কম সাজা ইহাও আমার বিবেচনা নহে। বালক বা যুবক জেলে যাইয়া নীচপ্রকৃতি চোর বদমায়েসের সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলে সে আর কখনও সৎলোক হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জেল সাধারণ-তন্ত্র নিয়মে পরিচালিত হয়, ভদ্র, অভদ্র, চোর কি সামান্য অপরাধীর কোন শ্রেণী বিভাগ নাই, সেখানে ভদ্র বংশের বালক বা যুবাকে পাঠান নৃশংসের কার্য্য বোধ হয়।

একদিন ফৌজদারী দরখাস্ত গ্রহণ করিতেছি, একটা আশ্চর্য্যজনক দরখাস্ত হাতে আসিল, তাহাতে এক ব্রাহ্মণ কন্যা প্রকাশ করিতেছে যে সে তাহার স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া

আসিয়াছে, সে বেশ্যা হইতে প্রস্তুত, তাহার নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুমতি হউক। এরূপ বিস্ময়কর দরখাস্ত কে দিল, চাহিয়া দেখি ঘরে কোন স্ত্রীলোক নাই। পেয়াদা বাহিরে নাম ধরিয়া ডাকিতে একটি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। সে পরমা সুন্দরী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুগোল সুঠাম শরীর, বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাহার স্বামীর বাস কলিকাতা বাগবাজার, জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। কাহার সঙ্গে আসিয়াছে, সে কথার জবাব দেয় না, কিন্তু সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইল না। তাহার গৃহের নিকটে এক সদ্ গোপের বাটী, সেই বাটীতে যশোহরের কোন লোক যাইয়া অল্পদিন ছিল। তাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে উপপতি তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলে বিপদ হইতে পারে সেই ভয়ে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহার নিকট তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা জ্ঞাত হইয়া তাহার স্বামীকে তারে সংবাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বামীর যশোহরে আসিতে ২।১ দিন বিলম্ব হইতে পারে, সে সময় তাহাকে কোথায় রাখা যায়? এরূপ সুন্দরী বাহিরে রাখা সহজ নহে। তাহাকে দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক জমায়েত হইয়াছে। তাহাকে জেলের হাজতে রাখিবার আজ্ঞা দিলাম। পরদিন তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি কোন অংশে কদাকার নহে, ও তাহার বয়সও অধিক নহে। কিন্তু দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, কিঞ্চিৎ রুগ্ন বোধ হইল। স্ত্রীলোকটিকে

জেলখানা হইতে আনা হইল, সহস্র লোক তাহাকে দেখিবার জন্য পশ্চাদ্‌গামী হইল। স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়া বলিল সে কখনই উহার গৃহে যাইবে না, সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার স্বামীও তাহাকে ছাড়িবে না। অল্পক্ষণ স্বামী স্ত্রীতে বকাবকি হইলে তাহাদিগকে কাছারির বাহিরে একটা ছোট ঘর ছিল সেখানে যাইতে বলিলাম। আজ্ঞা দিলাম সন্ধ্যার মধ্যে মীমাংসা করিয়া সংবাদ দিবে। একজন সর্ব্বকর্ম্মান্বিত মোক্তার তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইল। আর আমার নিকট আসে নাই।

এক মুসলমান যুবক জমিদার এক সুঁড়ি কন্যার প্রতি আসক্ত হয়। জমিদার খাজানা আদায় উপলক্ষে পাড়ায় যাইয়া ঐ মেয়েটিকে দেখে। পরে তাহাকে হরণ করে। তাহার স্বামী নালিশ করিল, আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, স্ত্রীলোকটাও ধরা পড়িল। মেয়েটার বয়স দেখিতে ১৩।১৪ বৎসর, কৃশা, বিশেষ সুরূপাও নহে। একখানি পাতলা তক্তার আকৃতি, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। তাহার কথাবার্ত্তাও বালিকার ন্যায়, সে বলে যে সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হইয়াছিল এমন সময় তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে এমন ক্ষীণাঙ্গী যে একজন বালক অনায়াসে তাহাকে ধরিয়া লইতে পারে। এ মোকদ্দমার অনেক রকম প্রমাণ প্রয়োজন, এজন্য দিন পরিবর্ত্তন হইল। আসামী জামিনে থাকিল। দুই দিন পরে জানিলাম যে আবার মেয়েটাকে হরণ করিয়াছে। আবার

ধৃত হইয়া আসিল। এবার তাহাকে হাজতে রাখিলাম। জজ সাহেবের হুকুমে জামিনে খালাস হইল। ঐ মেয়েটিকে অতি সাবধানে যশোহরে রাখা হইল। সেখান হইতে পুনর্বার হরণ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতক্ষণ কাছারি থাকিত আসামী ঐ মেয়েটার দিকে স্থির নজর রাখিত। লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া একদৃষ্টে ক্ষুধিত পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র যেন মৃগ শাবকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। Pitiable (সংকুপণাবস্থা) বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যায় এমন বাক্য নাই। রমণীর ও আসামীর প্রতি বীতরাগ নাই নিশ্চয়, কিন্তু তাহার অত্যাচার সমস্তই প্রকাশ করে ও বলে যে আসামী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। প্রেমের বয়স হয় নাই বোধ হয়। অথবা তাহার শরীরও যেমন শুষ্ক হৃদয়ও তদনুরূপ।

প্রায় সমস্ত গুপ্ত প্রণয়ের মোকদ্দমায় দেখা যায় ধরা পড়িলে, রমণী পুরুষটার বিপক্ষ হয় ও আত্মীয়দের সপক্ষ হইয়া উপপতিকে জেলখানায় পাঠাইতে কুণ্ঠিত হয় না। রমণী বিধবা হইলে আত্মীয়গণ অনধিকার গৃহপ্রবেশ ও চুরির দাবী করিয়া পুরুষটাকে বাঁধিয়া চালান দেয়, তখন রমণীটাও সেই চুরি মোকদ্দমা সমর্থন করে। এ সকল মোকদ্দমা বিশেষ সাবধান না হইলে অবিচার হইবার যথেষ্ট সম্ভব। কারণ পুরুষটা কোনও জবাবই দেয় না। কেবল সমস্ত মোকদ্দমা মিথ্যা ও সে ব্যক্তি ঐ সময় অন্যত্র ছিল এই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে।

যশোহরের জমি উর্ব্বরা, নিতান্ত গরীব দুঃখী কম, কিন্তু জেলাময় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব তখন ছিল, এখনও ১৬ বৎসর পরে সমানই আছে। লোক সংখ্যা ক্রমাগত ন্যূন হইতেছে। **Malthus Law of Population** এখানে প্রযুক্ত হয় না। বনগ্রামে থাকিতে এ বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। বহুদিন জ্বররোগে ভুগিয়া অবসরের প্রার্থনা করিলাম, নামঞ্জুর হইল, অগত্যা বদ্‌লির দরখাস্ত করিলাম। বগুড়ায় বদ্‌লি হইলাম।

বগুড়া

(সেপ্টেম্বর ১৯০১—১৫ জুন ১৯০৪)

পরিবারদিগকে কলিকাতায় নরেনের বাসায় রাখিয়া একলা বগুড়া গেলাম। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত, শরীরও দুর্ব্বল ছিল। সেখানে একটি কাঁচাগৃহ পাইলাম। পৌঁছিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে দক্ষিণ উরুতে প্রকাণ্ড এক স্ফোটক উৎপন্ন হইল। ক্রমে শয্যাগত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এইবার জীবনলীলা সম্বরণ হইবে। কলিকাতায় প্রথমে লিখি নাই। কৃষ্ণনগর দাদাকে লিখিলাম, তাহার দুই দিন পরে গৃহিণী দুই পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক মাসের অধিক পরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম।

তখন সম্রাট Edward এর অভিষেকের জন্য দেশময় বিরাট

আয়োজন হইতেছে। আমাদের বগুড়া জেলার অধিপতি তখন কুমার রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, তিনি যখন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন অল্পদিন একত্র বীরভূমে ছিলাম। তিনি সদাশয় নির্ম্মলচিত্ত ও দেশহিতৈষী। ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট দখল না থাকিলেও তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার সুশিক্ষিত ইংরাজ ভদ্রলোকের অনুরূপ ছিল। শরীর যথেস্ট সবল, কার্য্যক্ষম ও স্ফুর্ত্তি অসাধারণ। তাঁহার গৃহ ও উদ্যান সুসজ্জিত। উদ্যান সর্ব্ব ঋতুতে নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। তাঁহার পুষ্পোদ্যান স্মরণ হইলে অদ্যাপি মন পবিত্র হয়। মানসিক চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া আছে। বালক বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পথ বাজার পরিচ্ছন্ন রাখা, লোকের হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎযোগী, তবে বিধিসঙ্গত ক্ষমতার সীমার মধ্যে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকা তাঁহার সহিষ্ণুতায় কুলাইত না। উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী লোকদিগের দমন, সাধারণ পথরোধ করা পল্লীগ্রামের চিরন্তন প্রথা, বেড়া ঠেলিয়া ক্রমে ক্রমে পথ সঙ্কীর্ণ করা বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত। রামেন্দ্রকৃষ্ণ সংবাদ পাইলে যতদিনের অবরোধ হউক না কেন তাহা উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন।

আমি রোগমুক্ত হইয়া প্রথমে শুনিলাম যে তিনি স্থির করিয়াছেন রাজ্যাভিষেকের জন্য চাঁদা করিয়া তিনি ৫০,০০০৲ টাকা উঠাইবেন এবং ঐ টাকার মধ্যে ৫০০০৲ টাকা সাধারণের আমোদ, প্রমোদ, যাত্রা, নাচ, ভোজ, বাজী, গরীব দুঃখীকে দানের জন্য ব্যয় হইবে।

অবশিষ্ট ৪৫০০০৲ টাকা দ্বারা সাধারণের জন্য স্থায়ী উদ্যান সভাগৃহ, নাট্যশালা ও অতিথিশালা প্রস্তুত হইবে। ক্ষুদ্র বগুড়া জেলা হইতে ৫০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিবে শুনিয়া প্রথমে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও কুমার বাহাদুরের ধৃষ্ঠতা। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেহ ছিলেন না একজন ইন্স্পেক্টর ঐ কার্য্যে ব্রতী আছেন। তিনিও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতের সাপক্ষে কাজ করিবেন বুঝিলাম। আমি আপত্তি উত্থাপন করাতে রামেন্দ্রকৃষ্ণ বলিলেন যে বগুড়া জেলা বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় দবিদ্র নহে। এখানকার কৃষিজীবি লোক মাত্রই সঙ্গতিপন্ন ও ইহারা সকলেই অর্থশালী। আমিও অনুসন্ধানক্রমে জানিলাম সে কথা সত্য। এখানকার জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, যথেষ্ট শস্য জন্মে। পাট ও রেশমে প্রজারা বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করে। তাহাদের গৃহ সমস্তই কাঁচা, খরচ পত্র সামান্য, কেবল মোকদ্দমায় অন্যায় খরচ করে, কিন্তু সাধারণতঃ মিতাচারী ও মিতব্যয়ী। তাঁহাদের পক্ষে ৬০।৮০।১০০৲ টাকা চাঁদা কঠিন নহে। অনেকেই দিতে পারে। কিন্তু সভাগৃহ, নাট্যশালা, উদ্যান কাহাকে বলে তাহারা জন্মে কখনও দেখে নাই, সে যে কি বস্তু তাহাও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ, হইলেও বগুড়া নগরে নির্ম্মাণ হইলে জেলার কৃষকদিগের সে সমস্ত কি উপকারে আসিবে সে কথা তাহাদিগকে বুঝান বা কিরূপে যাইবে? প্রতি গণ্ডগ্রামে শাখা সমিতি গঠিত হইল। গ্রামের প্রধান লোক ও কৃষকদিগকে সেখানে একত্র করিয়া কে

কত চাঁদা দিবে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। কুমার বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সভ্যেরা একস্থানে বসিয়া কে কত টাকা চাঁদা দিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া লিখিত হইতেছে। দেখিলাম কেহ ৪০৲, কেহ ৬০, কেহ ৭০৲ টাকা দিবে প্রতিজ্ঞা করিতেছে। একবার হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া গৃহের পশ্চাৎ ভাগ দেখিতে গেলাম। সেখানে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রজাদিগকে সমঝাইতেছে। গুরুতর ব্যাপার, সম্রাটের অভিষেক, রাজভক্তি, রাজার বা কর্ত্তৃপক্ষদিগের কোপ, তোমার এত টাকা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা আসলে কি হইতেছে। একদিন রবিবারে যখন আর সেখানে কেহ নাই সেই সময়ে কুমার বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম এ কার্য্যটা দোষশূন্য নহে। ইহার জন্য ভবিষ্যতে তিনি বিপদে পড়িতে পারেন। অন্যায় কার্য্য বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে যদি আন্দোলন উঠে তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে নিশ্চয়ই দোষী করিবেন। পুলিশকে পত্র লেখা হউক যে পুলিশ এ কার্য্যের সংশ্রবে না থাকে এবং কোনও টাকা তাহারা নিজ হস্তে গ্রহণ না করে, সমস্ত টাকা আমার নিকট (Treasurer of the fund) গ্রাম্য লোকেরা ও সমিতির সভাপতিগণ পাঠাইবেন। এই মর্ম্মে একখানা ইংরেজী পত্র পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আর একখানি বাঙ্গালা পরোয়ানা সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট যাহা পাঠাইতে হইবে তাহার মুসাবিদা লিখিয়া কুমার বাহাদুরের দস্তখত করিয়া পাঠান

হইল। এই পত্র ও পরোয়ানা ভবিষ্যতে সমূহ উপকারে আসিয়াছিল। যদিচ আমার বিশ্বাস যে ওই পত্র ও পরোয়ানা দ্বারা চাঁদা উঠাইবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মের কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। নগরের ভদ্রলোকেরা সরকারী কর্ম্মচারা উকিল মোক্তার প্রায় কিছুই দেয় নাই। তথাপি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়াছিল। কৃষি প্রদর্শনী, নাটক, যাত্রা, বাজি, Gramophone (তখন নূতন) আলোক বালক বালিকা ও দরিদ্রদিগের ভোজ প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ এক সপ্তাহ চলিল। সে সমস্ত সম্পন্ন হইলে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল। তাহা হইতে বগুড়ার অধুনা প্রসিদ্ধ Coronation Park নামক উদ্যান এবং তন্মধ্যস্থিত থিয়েটারগৃহ ইত্যাদি পরে রচিত হয়।

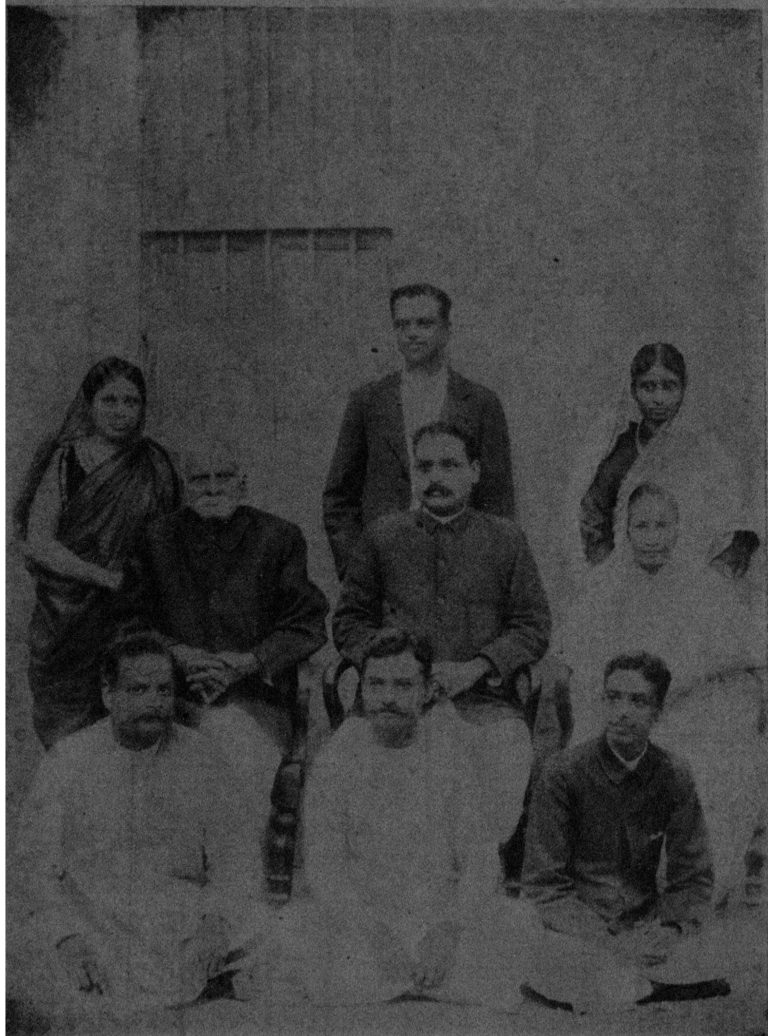
কৃষ্ণনগর

(১৯০৪ জুন ১৫ হইতে)

চাকরি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর আসিয়া পাকা আড্ডা গাড়িলাম। প্রথম গৃহ সংস্কার না হইতেই জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের জ্বর হইয়া ২০।২৫ দিন ভুগিল। অপরিচ্ছন্ন গৃহে থাকিলেই রোগ ধ্রুব নিশ্চয়। গৃহ অল্পদিন ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক জঙ্গল পূর্ণ, ভিতরেও ময়লা।

সপরিবারে মন্মথকুমার বসু

(১৯১৩)



উষা মন্মথকুমার নরেন্দ্র — সত্যেন্দ্র সুরেন্দ্র বীরেন্দ্র — লাবণ্য বসন্তকুমারী সুকুমার

পুরী

আশ্বিন মাসের শেষে পুরী যাত্রা করিলাম। মেজদাদা, তাঁহার স্ত্রী, ও আমাদের ভগি সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা তীর্থ করিবেন। সকালে পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, ষ্টেশনে গাড়ী ছিল না, মহিলাদিগকে গো-শকটে উঠাইয়া আমরা পদব্রজে চলিলাম। পথে প্রতিপদে এক এক জন আসিয়া প্রশ্ন করে কোথায় যাবে ও পাণ্ডা কে। উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। এক একবার বলি যমের বাটী যাইতেছি, তাহাতে নিস্তার নাই, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তর না দিলেও ছাড়ে না। আমাদের বাসা স্থির ছিল না, প্রশ্নের জ্বালায় বিব্রত হইয়া সিংহ দরজার সামনে একটা দোতালা ঘরে ব্যস্তক্রমে বাসা লইলাম। আমাদের বংশের পূর্ব্বের পাণ্ডার নাম বিস্মৃত হইয়াছিলাম। একজন পাণ্ডা স্থির করিয়া লইলাম। নানা প্রকারে যাত্রীদিগকে দোহন করা উহাদের কার্য্য। পাণ্ডা সম্পত্তিপন্ন লোক, যথেষ্ট ভৃত্যাদি আছে। সঙ্গে চাকর ছিল, একজন সূপকার ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল। যাত্রীরা প্রসাদদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু প্রসাদ বেলা ২টার পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। আর সে তরকারি তেমন মুখরোচক নয়। মৎস্য মাংসের প্রসাদ হয় না। খিচুড়ি, তরকারি, অম্বল, পায়েশ রশুই হইয়া থাকে। অগ্রে মূল্য দিলে আবশ্যক মত আকারের হাঁড়িতে রশুই হইয়া ভোগের পর আট্‌কে বিলি হয়।

বিকালে সমুদ্র দেখিতে গেলাম। তরঙ্গের আস্ফালন দেখিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইল। নীলবর্ণ অসীম জলরাশি দিগন্ত বিস্তৃত, আর সম্মুখে ভীষণ শব্দায়মান তরঙ্গ বেলাতটে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া আনন্দে মোহিত হইতে হয়।

মন্দির দেখিতে গেলাম। আকার ও গঠন মনোরম হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের গায়ে যে সকল বীভৎস, অশ্লীল অপ্রাকৃত জঘন্য মূর্ত্তি গঁড়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া সম্পূর্ণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। আঙ্গিনার চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সেগুলি বিশেষ কিছুই নহে। মন্দিরটী কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে গঠিত, সেইটী নীলাচল বলিয়া খ্যাত। বৃহৎ মন্দির তিনটী মন্দিরের সমষ্টি। প্রকোষ্ঠগুলি বৃহৎ, যে প্রকোষ্ঠে বিগ্রহ আছেন সেটী আয়তনে অনেক বড়। উত্তর ভারতে কোথাও এরূপ বৃহৎ প্রকোষ্ঠ কোন মন্দিরে নাই। বিগ্রহগুলির কারুকার্য্য কিছুই নাই বলিলে হয়। তবে বসন ভূষণ দিয়া সাজাইলে ভক্তের চক্ষে যথেষ্ট প্রীতিকর হয়। গভর্ণমেণ্ট এখন মন্দিরের Trustee, একজন হিন্দু ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্যাধ্যক্ষ, বোধ হয় তিনি কিছুই করেন না। অনেক স্থল অপবিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। এই জঘন্য পুত্তলিকা-গুলি কেন ধ্বংস করা হয় না ইহার উত্তর কে দিবে।

সমুদ্রে স্নান করা যথেষ্ট আরামপ্রদ, কিন্তু সাবধান না হইলে পড়িয়া ডিগবাজি খেলিতে হয়, বস্ত্রাদি খুলিয়া যায় ও লবণাম্বু গলাধঃকরণ করিয়া উঠিতে হয়। তরঙ্গের আস্ফালনের বিরাম নাই। বিনা অভ্যাসে সাবধান হওয়া যায় না। হঠকারিতা

করিতে গেলে জখম হইবারও সম্ভাবনা আছে। অক্ষম লোকের জন্য ধীবরগণ আছে, তাহারা পয়সা পাইলেই ধরিয়া লইয়া স্নান করায়।

আমি ইহার পরে আরও দু'বার পুরী গিয়াছিলাম। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বিকালে এক এক দিন বায়ুবেগ কম থাকে, তরঙ্গও কমিয়া যায় তখন নৌকায় ভ্রমণ করিতে বেশ আরাম। বৃহৎ জাহাজ কূল হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে থাকিয়া দ্রব্যাদি বোঝাই করে। নৌকা করিয়া চাউল লইয়া জাহাজ বোঝাই করে, মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের আস্ফালনে চাউলের নৌকাও জলশায়ী হয়। জোয়ারের সময় ঢেউ অনেক উপরে উঠে। বিকালে বালির উপর সকলেই বেড়ায়। কেহ কেহ মজলিস্ করিয়া বসে। একদিন ঐরূপ কতকগুলি বাঙ্গালী মহিলা একত্র বসিয়া গল্প করিতেছে একটি প্রকাণ্ড তরঙ্গ হঠাৎ আসিয়া তাহাদের উপরে পড়িল, তাহারা সকলে ডিগ্‌বাজি খাইয়া ধড়্ ফড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। আর্দ্র বস্ত্র ভিন্ন আর কিছু ক্ষতি হইল না।

মন্দিরে দেবদাসীরা আছে, তাহারা পার্ব্বণের সময় বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করে। একদিন তাহাদের গান শুনিয়াছিলাম। জয়দেবের পদাবলী সুন্দর গায়। অবশ্য উচ্চারণ বাঙ্গালীর মত নহে। 'য়' কে 'ইঅ' উচ্চারণ করে, ইত্যাদি সংস্কৃতের অনুরূপ। বাঙ্গালীরা সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণ করিয়া তাহার মধুরতা একেবারে লোপ করিয়া দেয়।

পুরীতে মৎস্য তরকারি সস্তা, কিন্তু দুগ্ধের মূল্য কলিকাতা

অপেক্ষাও অধিক। পুরীতে অনেক মঠ আছে, তাহাতে অনেক সন্ন্যাসী বাস করে। কথিত আছে ৫০০ মঠ। এক একটা মঠ অতি প্রকাণ্ড রাজপুরীর ন্যায়। শঙ্করাচার্য্যের মঠ বৃহৎ নহে। তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি আছে, কতকগুলি গ্রন্থও আছে। সকল মঠেরই সম্পত্তি আছে। কোন কোন মঠ যথেষ্ট ধনশালা। হাতী, ঘোড়া, মটর গাড়া আছে। প্রতি মঠের সন্ন্যাসীদিগের জন্য আহার মন্দিরের প্রসাদ হইতে যায়। বেলা ২টার পর দেখা যাইবে ভারে ভারে আট্‌কে যাইতেছে। পুরীতে জাতি বিচার নাই, প্রসাদ যে কোন জাতীয় ভারবাহী লইয়া যাইতে পারে। মন্দিরের পাশেই একটা স্থান আছে, তাহাকে আনন্দ বাজার বলে, সেখানে উদ্বৃত্ত প্রসাদ বিক্রয় হয়, বিকালে সেখানে গেলেই কেহ না কেহ ভাত লইয়া মুখে দিতে আইসে।

যাত্রীদিগকে দোহন করিবার অনেক উপায় আছে। ইহার মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন। পাণ্ডাঠাকুর ও তাহার বন্ধুবর্গ নিমন্ত্রণে আসিলেন, মন্দির হইতে প্রসাদ আসিল। সকলে আহারে বসিলেন, যাত্রী যে জাতি হউক না কেন তাঁহারাও বসিবেন, পরে পাণ্ডাঠাকুর যাত্রীদের মুখে অন্ন দিবে, ও যাত্রীরা পাণ্ডার মুখে অন্ন দিবে। আমার সহযাত্রীরা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। পাণ্ডার এক চেলা আমাকে ধরিলেন আহারে বসিতে হইবে। আমি বলিলাম আমি কাহারও মুখে ভাত দিতে পারিব না, ও কাহারও উচ্ছিষ্ট মুখে লইতে পারিব না।

সে ছাড়িবে না, কারণ ইহাতেও পাণ্ডা টাকা পাইবে। অনেক বচসার পর সে ক্ষান্ত হইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ঠাকুর লইয়া বাইচ হয়; গান হয় ও বাজার বসে। ঐ সরোবরের পার্শ্বে বিজয় গোস্বামীর মঠ। ইনি হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া কিছুদিন ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, পরে আবার বৈষ্ণব হন। তাঁহার মঠে তাঁহার নিজ বিগ্রহ আছে, কতকগুলি শিষ্য আছে, তাহারাও বিগ্রহকে ভোগ দেয়; তাহার মধ্যে দুইবার 'চা' ভোগ, তিনি একজন 'চা'র ভক্ত ছিলেন। মরিয়াও 'চা'র লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। এই সব দেখিলে বোধ হয় কিনা যে হিন্দুর দেবতা সকলেই মনুষ্য মাত্র—সাধারণ মানুষ কেহ কেহ ক্ষমতাশালী ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের গুণাবলী ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া অমানুষিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পুরাণকারগণ বর্ণনা করাতে দেবত্বে পরিণত হইয়াছেন।

একদিন চিল্কা হ্রদ দেখিতে গেলাম, রম্ভা ষ্টেশনে নামিয়া চিল্কায় নৌকা করিয়া ভ্রমণ করা যায়। হ্রদের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট চৌকি ঘর আছে, লবণের চৌকি থাকিত। হ্রদ গভীর নহে, দূরে দূরে পাহাড় আছে, তাহাতে গৃহাদিও আছে, দেখিতে সুন্দর। পুরী হইতে আসিবার সময় ভুবনেশ্বরে গেলাম। এই বায়ু পুরাণের একাম্রবন। এখানে অনেক মন্দির আছে, ও বিন্দুসাগর নামে বৃহৎ সরোবর। দেখিলেই বোধ হয় পূর্ব্বে একটী বৃহৎ নগর ছিল, এক্ষণে কেবল কতকগুলি ভগ্ন মন্দির আছে। প্রধান মন্দির ভুবনেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার। শেষোক্ত

মন্দিরের কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। এখানেও জাতি বিচার নাই। মন্দিরগুলি সুন্দর গঠিত, আর বীভৎস, জঘন্য পুতুল নাই। দেবীর মন্দিরের বাহিরের গায়ে অনেক সুন্দর পুত্তলিকা গঠিত আছে, কিন্তু ঐ পুত্তলিকাগুলির আকৃতির ইতর বিশেষ নাই। নীচেও যত বড়, ঊর্দ্ধেও তত বড়। কাজেই উপরেরগুলি ক্ষুদ্র দেখায়। সকল মন্দিরই প্রস্তর গঠিত। অনেকগুলি কষ্টি পাথরের। একটি ভগ্ন মন্দিরে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, তাহার নিম্নভাগ দিয়া ক্রমাগত জল উঠিতেছে, জল অতি পরিষ্কার ও সুপেয়। বিন্দু সরোবরের মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপ আছে। জল বিন্দু বিন্দু উদ্ভিদানু পূর্ণ। স্থান যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর।

এখানেও আহারের জন্য মূল্য দিয়া প্রসাদ কিনিতে হয়। প্রসাদ খরিদ করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আহার করিলাম ও দুইজন পাণ্ডাকে দিলাম। পাণ্ডাগণ দহি, অম্বল, তরকারি, ডাইল, ভাতের সহিত একত্র মাখিয়া খাইতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যাদি এখানে সুলভ। লোকসংখ্যা অতি অল্প, একটি সামান্য গ্রাম মাত্র। বিকালে হাট হয়, হাটে পুস্তকাদি বিক্রয় হয়।

সেখান হইতে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিতে গেলাম। দুইখানি গোশকটে আমরা উঠিলাম, ও এক বেলার উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ও কাষ্ঠ সঙ্গে লইলাম। ৫ মাইল পথ যাইয়া ঐ স্থানে পৌঁছিলাম। একটী ডাক বাঙ্গালা আছে, তথায় খাদ্য-দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না।

খণ্ডগিরি একটী ক্ষুদ্র শৈল। তাহাতে অনেকগুলি কৃত্রিম

গুহা ও তন্মধ্যে অনেকগুলি পুত্তলিকা আছে। প্রায় সমস্তই ভগ্ন। গুহাগুলি সেকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু শ্রমণ-সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে সমস্তই দর্শন করা যায়।

উদয়গিরি তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; উচ্চে ১৫০ হস্ত হইবে ও বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। উঠিবাব পথ আছে, উপরে একটী জৈন মন্দির আছে। আধুনিক মন্দির, দুইটী নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ ও তৎসংলগ্ন থাকিবার বা রসুই কবিবার ঘর। আমরা মন্দিরে আড্ডা লইলাম। কয়েকটী প্রস্রবণ আছে, একটীর জল উৎকৃষ্ট। আমরা সেখানে রান্না করিয়া আহার করিলাম, ও দ্বিপ্রহরেব প্রখর সূর্য্যতাপের সময় মন্দির অতি সুখকর বিশ্রাম স্থান হইল, সুশীতল বেদীর উপব শযন কবা কোন জৈনের আপত্তিজনক কিনা তাহাও সেখানে জানিবার উপায় ছিল না। ডাকবাংলার রক্ষকই ইহার তত্ত্বাবধায়ক। সে একখানি বহি দেখাইল, তাহাতে অনেক বড়লোকের নাম আছে যাঁহারা মন্দির দেখিতে আসেন। পাহাড়ে উঠিতে অর্দ্ধ পথে একটী গুহা আছে, তাহাও ভগ্নাবশিষ্ট।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া একদিন সকালে চা পান করার জন্য অনেক ঘুরিলাম, কোথায়ও পাইলাম না, এখন অনেক চা'র দোকান হইয়াছে, তখন একটীও ছিল না, সে এখন ১২ বৎসব পূর্ব্বে বই নহে। সেখান হইতে কারমাটার গেলাম। তথায় এক টুকরা জমি লইয়াছিলাম, তাহার পাট্টা কবুলতি হইল, ঐ জমি ৫।৬ বৎসর পবে বিক্রয় করিয়াছিলাম।

বিদ্যানন্দকাটি স্কুল।

১৮৭০ সালে খুড়ামহাশয় ৺রাসবিহারী বসু এই স্কুল স্থাপন করেন। ইহা Minor School, এখান হইতে ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়া High Schoolএর তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। Minor School ছাত্রেরা কেহ বৃত্তি পাইত। ইহার সংলগ্ন একটি বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল, সে Lower Primary। খুড়া মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল সেখানে সংস্কৃত, ইংরাজিও অধ্যয়ন হইবে। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। এই দুই স্কুলের আয়, প্রথম খুলনা Waqf fund হইতে ১৫৲ টাকা পাওয়া যাইত। কারণ বিদ্যানন্দকাটী গ্রাম Waqf বিষয় ভুক্ত। আর যশোহর District Board ২০৲ টাকা চাঁদা Minor Schoolএর জন্য দিতেন। ইহা ভিন্ন চাঁদা ও ছাত্রের বেতন। দুইজন ইংরাজি মাষ্টার ও দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। খরচ প্রায় ৬০৲ টাকা। খুড়ামহাশয় একটি পাকা দালান স্কুলের জন্য দিয়াছিলেন, খুড়ামহাশয়ের কাল হইলে দাদা রায় প্রসন্ন কুমার বসু বাহাদুর সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯০০ সালে যখন আমি যশোহরে ছিলাম, তখন দাদা ঐ কার্য্য ত্যাগ করিলেন ও আমি সেক্রেটারী হইলাম।

চাঁদা অতি অল্পই আদায় হইত, খুড়ামহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র মাসে ৫৲ টাকা দিতেন ও আরও কেহ কেহ এক

টাকা করিয়া দিতেন। আমাদের গ্রামের প্রধান ধনী রায় দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর কখনও দিতেন কখনও বন্ধ করিতেন।

১৯০১ সালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিখর কুমার বসু ডাক্তার গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। তিনি ও গ্রামের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া উহাকে High Schoolএ পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। দেখা গেল যে Minor School আর সাধারণের প্রীতিকর নহে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইয়া আর তখন পূর্ব্বের ন্যায় কেহ মোক্তারী পরীক্ষা দিতে অথবা Medical Schoolএ প্রবেশ করিতে অধিকারী হয় না। আমি সম্মত হইলাম। Universityতে স্কুল affiliated হইল। দুই একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০ শত হইল, একজন B. A. পাস শিক্ষক ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই ছাত্র সংখ্যা কমিতে লাগিল। গ্রাম এত ক্ষুদ্র যে তাহা হইতে ২০।৩০ জনের অধিক ছাত্র হইতে পারে না। চতুষ্পার্শ্বে মুসলমানের গ্রাম। মুসলমানগণ তখনও ইংরাজি পড়িতে তত অগ্রসর হয় নাই। দূরাবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে ছাত্র আসিতে পারে, কিন্তু তাহাদের বাসের স্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করা চাই। গ্রামের মধ্যে ২।৩ জন মাত্র সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন যাঁহারা এক অথবা দুইজন ছাত্রকে রাখিতে পারেন। হোষ্টেল প্রস্তুত ও তাহা চালান অনেক ব্যয়সাধ্য।

ক্রমে স্কুল রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। ১৯০৫ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ও মেজদাদা বসন্ত কুমার বসু বাটী যাইয়া স্কুলের আয় বৃদ্ধির নানা প্রকার চেষ্টা ও যাহাতে অন্য স্থানের ছাত্রেরা আসিয়া থাকিতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিলাম। ১৯০৬ সালেও আমরা দুইভ্রাতা সেইরূপ চেষ্টা করিলাম ও কোনক্রমে স্কুল খাড়া রাখা গেল। ১৯০৭ সালে এক মুসলমান Dy. Inspector of Schools যশোহরে অধিষ্ঠান করিলেন, তিনি বলিলেন District Board যে ২০৲ টাকা দিয়া High Schoool এর সাহায্য করেন ইহা অবৈধ। তিনি ঐ সাহায্য উঠাইয়া দিলেন।

তখন ছাত্র সংখ্যা ৪০ জনেরও কম। আমি ও Secretary কার্য্য হইতে অবসব লইলাম। যে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা এত অল্প তাহাকে ১৫০৲ টাকার অধিক মাসে ব্যয় করিয়া রক্ষা করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। বিশেষ আমার বিবেচনায় High School এ ব্যায়াম শিক্ষা, Drawing, কিঞ্চিৎ শিল্প শিক্ষাবও Library র বন্দোবস্ত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, এরূপ ক্ষুদ্র স্কুলে সে সমস্ত অসম্ভব। আমি যশোহরে থাকিতে ব্যায়ামেব জন্য যন্ত্রাদি কিছু দিয়াছিলাম, পরে কিছু মানচিত্র ও পুস্তকাদি দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে।

১৯১২ সালে আমি গভর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রার্থনা কবি যে সমস্ত High School এ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিল্প শিক্ষা প্রবেশ করান অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। হরনেল সাহেব Director এর সহিত এ বিষয়ের জন্য সাক্ষাৎ করি, তিনি

বলেন যে তাঁহার এবিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; কিন্তু দেশের লোক এখনও সেরূপ উন্নতবুদ্ধি হয় নাই। তিনি ক্রমে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, এখন ব্যস্ত হইলে চলিবেনা, বরং তাহাতে ।মূহ ক্ষতি হইতে পারে, ব্যস্ত হইলে ২০ বৎসরের মধ্যে প্রস্তাব সফল হইবে না। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সে অতিরিক্তের কথা। University কখনই সম্মত হইত না, দেশের লোকের মতিগতিও সেরূপ নহে। ১৯১৪ সালে যখন কৃষ্ণনগরে Congressএব Provincial Conference বসে তখন একথা উত্থাপন করা হইয়াছিল ও গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু অনেকে আপত্তিও করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় Government Executive Councilএর member নবাব হুদা সাহেবের নিকট এ বিষয় উত্থাপন করি, তিনি বলিলেন ভদ্রলোকেব সন্তান শিল্প শিখিবে এ কখনই লোকে সম্মত হইবে না। হরনেল সাহেব এ বিষয়ে ক্রমে অগ্রসর হইতে-ছেন তাহা বোধগম্য; কিন্তু অদ্যাপি বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না।

বিদ্যানন্দকাটী স্কুল ইহার পরে দুই মাইল দূবে স্থাপিত হইয়াছে, এখন উন্নত হইবে আশা করা যায়।

তীর্থ পর্য্যটন

১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলাম। ৪র্থ ও ৫ম পুত্র বার বার জ্বর হইয়া রুগ্ন হইয়াছিল। তাহাদের দুই জনকে লইয়া আমরা স্ত্রী-পুরুষে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে রসুই করিবার জন্য একটী স্ত্রীলোক ছিল।

প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যমুনা সেতুর নিকটে একটী বাগান-বাড়ীতে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ভ্রমণের বিশদ বৃত্তান্ত লেখা নিষ্প্রয়োজন। বহু লোকে এই সকল স্থান দেখিয়াছেন ও অনেক উৎকৃষ্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রয়াগ হইতে আগ্রা, সেখানে আমাদের একজন আত্মীয় বেণীমাধব সরকার কলেজের উপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহার গৃহে বাস করিলাম। সেখানে তাজমহল, সেকেন্দ্রা, বাদ্‌শার প্রাসাদ, প্রভৃতি দেখিয়া ফতেপুর শিকরি গেলাম। আগ্রা ও ফতেপুরের সৌধমালা দেখিয়া বাদশাহী ভারতের বিলাসিতা শিল্পকৌশল ও মহত্ত্ব চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। মথুরা ও বৃন্দাবন গেলাম। মথুরা কেবল ভগ্ন স্তূপরাশি—গৌরব করিবার কিছুই নাই। বৃন্দাবন চৈতন্য-ভক্ত শিষ্যের নিকট অতি মনোরম ও পবিত্র স্থান। কিন্তু যেখানে কুঞ্জ ও কুণ্ড অর্থে প্রকাণ্ড অট্টালিকা বা মন্দির, যেখানে উপবন-স্থানে ইষ্টকালয়সঙ্কুল নিবিড় গৃহপূর্ণ নগর, সেখানে সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করা বৃথা। তবে কতকগুলি ব্যয়সাধ্য মন্দির

আছে বটে, কিন্তু আগ্রা দেখিবার অব্যবহিত পরে এগুলি চক্ষে পড়ে না।

পরে কাশী আসিলাম। কাশীতে ৬।৭ দিন ছিলাম, একটী বৃহৎ ত্রিতল গৃহ প্রত্যহ দুই টাকা ভাড়ায় পাইলাম। কাশীতে নৌকাযোগে গঙ্গায় ভ্রমণ বেশ সুখপ্রদ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কাশী আসিয়াছিলাম। ইহার পরেও আর একবার গিয়াছিলাম। সারনাথে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কেবল এক প্রান্তরের মধ্যে দুইটী স্তূপ দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিলাম সেখানে প্রান্তরের স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া পুরাতন গৃহাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে—ও গৌতম বুদ্ধের সময়ের তৈজসপত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপে তিন সপ্তাহ ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করিলাম।

একটী অবান্তর গল্প—লোকনাথ মিত্র।

লোকনাথ মিত্র P. W. Department Supervisor ছিলেন। তিনি আমার পূর্ব্বে পেন্সন লইয়া কৃষ্ণনগরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা। পুত্রটী কুস্বভাবান্বিত, পিতা মাতার সঙ্গে তার বিবাদ। ১৯০৪ সালে আমি যখন এখানে আসি তখন লোকনাথের বৃদ্ধা স্ত্রী ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই। পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, একটী

সন্তানও হইয়াছে, পুত্রবধু কখনও এখানে, কখনও পিত্রালয়ে থাকেন। পুত্র ভবঘুরে, কন্যাটিরও বিবাহ হইয়াছে। লোকনাথের গৃহ আমার গৃহ সংলগ্ন। তিনি প্রত্যহ আমার গৃহে আসিতেন ও দুইজনে পাশা খেলিতাম। হঠাৎ একদিন শুনিলাম তাঁহার শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে। এখানকার চিকিৎসকেরা তাহাকে কলিকাতা যাইয়া চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি সস্ত্রীক কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি দেখিতে গেলাম। অন্যান্য কথা হইল, কিন্তু আমার মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাকে বলিব যে একটী উইল করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনের আশা ও শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন ইত্যাদি কথায় ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমার সাহসে কুলাইল না। এই অন্যায় ভয়ের জন্য আমি অনেক অনুশোচনা করিয়াছি। তিনি চলিয়া গেলে তিন দিন পরে তারে সংবাদ পাইলাম তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতে হইবে। অন্য কোন অভিভাবক বর্ত্তমান ছিল না, আমি তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় তাঁহার বাসায় পৌঁছিলাম। যাইয়া দেখি তিনি অজ্ঞানাভিভূত ও তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীকেও নিকটে যাইতে দেয় না, আর বাবা, বাবা করিয়া এমন পিতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছে যে নিতান্ত পিতৃভক্ত ভিন্ন সেরূপ সম্ভব নহে। যদিও মনে অত্যন্ত সন্দেহ হইল; কিন্তু আমি কি করিতে পারি? লোকনাথের স্ত্রী কিছু বলিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্র আমার সঙ্গ ত্যাগ করে না;

তিনিও বলিতে পারিলেন না। আমি সে রাত্রি আমার পুত্র নরেন্দ্রের বাসায় থাকিলাম। প্রভাতে একটী বালক আসিয়া আমাকে এক গোছা চাবি দিল, বলিল "লোকনাথের স্ত্রী পাঠাইযাছেন।" আমি কৃষ্ণনগর ফিরিয়া আসিলাম। তাহার দুই দিন পরে লোকনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিযা সম্পন্ন করিযা স্ত্রী, পুত্র কৃষ্ণনগর ফিরিয়া আসিল। তখন পুত্র জ্যোতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে. হাতে এক ছড়ি নিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘোবে, বলে এ সমস্তই আমার, গৃহে তৈজসপূর্ণ সমস্ত বাক্স আলমারী খুলিয়া দ্রব্যাদি লইল। দুইটা লোহাব সিন্দুক ছিল, তাহাব চাবি খুঁজিয়া পায় না, মাতাকে ভয দেখায়, প্রহার করিতে যায়। তিনি পলাইয়া আমাব গৃহে আসিলেন। আমি বলিয়া পাঠাইলাম চাবি আমাব কাছে আছে, দুই এক দিন পবে সিন্দুক খোলা যাইবে। আমাব অনুরোধে পুলিশ Superintendent তাহার গৃহে যাইয়া জ্যোতিকে কিছু শাসন কবিলেন। তাহাতে তাহার হাঙ্গামা ও মাতাব প্রতি অত্যাচার নিবাবণ হইল। পরে আমি, দাদা ও আর দুইজন ভদ্রলোক তাহার গৃহে যাইয়া জ্যোতির সম্মুখে লৌহ সিন্দুক খুলিলাম। তাহাতে তিনখানি উইল পাইলাম, তাহাব একটীও আইন সঙ্গত নহে। কিন্তু প্রত্যেকটিতে পুত্রকে ত্যাজ্য বলিযা লিখিত আছে। একটী সিন্দুকে একখানি ইষ্টক পাওয়া গেল, তাহার উপরে এক টুকরা কাগজে লেখা "জ্যোতি এই ইষ্টকখানি মাত্র উত্তরাধিকার-

সূত্রে পাইবে।” যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে একখানা উইল পাওয়া গেল যাহা কতক পরিমাণে ব্যবস্থা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেই খানার উপর নির্ভর করিয়া লোকনাথের হতভাগ্যা স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সম্পত্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ Promisory note, গোয়াড়িতে দুইটী দোতালা গৃহ মায় তৈজসপত্র ও কিছু জমি, সর্ব্বশুদ্ধ মূল্য ২০,০০০৲ টাকা হইবে। জ্যোতি আমাদের আগ্রহ দেখিয়া ভীত হইল ও তাহার মাতাকে মাসিক ১৫৲ টাকা খোরপোষ দিতে স্বীকৃত হইল। একটী বাটী যাহার ভাড়া ১৮৲ টাকা ছিল তাহাই জামিন স্বরূপ মাতার নিকট বন্ধক দিল। তাহার মাতা কাশীবাসী হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ৭০০৲ টাকা পাইলেন, ঐ টাকা ও দলিল কুমারখালি ব্যাঙ্কে রাখিয়া আমার নামে একটা আমমোক্তার নামা লিখিয়া দিয়া বিদায় হইলেন।

জ্যোতি দিন কতক খুব বড় লোকের ন্যায় খরচপত্র করিতে লাগিল, জন কতক মোসাহেব জুটিল, আর একটা বিবাহ করিল। সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহার মাতার প্রাপ্য টাকা না দেওয়াতে তাহার নামে নালিশ উত্থাপন করিলাম। ক্রমে তাহার গৃহাদি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার মাতা এই ১৩ বৎসর কাশীতে আছেন ও আমি তাঁহাকে মাসে ১৫৲ টাকা পাঠাইতেছি। সে গৃহ অপর লোকে ঐ দায় সহ ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহার

নিকট মাসে মাসে টাকা আদায় করা আমার এক কার্য্য। এই এত হাঙ্গামা ও বিরক্তিকর কার্য্য কিছুই প্রয়োজন হইত না, যদি লোকনাথ যখন কলিকাতায় যাত্রা করেন তখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া অনুরোধ করিতাম যে একখানি দস্তুর মত উইল প্রস্তুত করেন। তাহা হইলে লোকনাথের পৌত্রেরা অন্য পথের ভিখারী হইত না।

বঙ্গমাতার দেহচ্ছেদ

১৯০৫ সাল ১৭ই অক্টোবর হইতে বড়লাট Lord Curzon বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভাগ করিলেন। ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম প্রদেশ এক অংশ ঢাকার Lieut. Governor-এর অধীন হইল। পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা কলিকাতা Lieut. Governor-এর অধীন হইল। বাঙ্গালা প্রদেশ অত্যন্ত বৃহৎ ও এক গভর্ণর শাসন করিয়া উঠিতে পারেন না, এই উদ্দেশ্যে বিভাগ করা বিধেয় ইহাই Government-এর প্রকাশ্য অভিপ্রায়। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ পত্রে ইহার প্রতিবাদ জুন মাস হইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে দেশীয় সংবাদ পত্র সকলেই **এই** প্রতিবাদে যোগ দিল, স্থানে স্থানে সভা হইয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে অনেক বক্তৃতা হইল। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসীরা একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিবার অন্য কোন উপায়

না পাইয়া বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প হইল। ম্যানচেষ্টার প্রস্তুত বস্ত্র এদেশের প্রধান পণ্যদ্রব্য—এই বস্ত্র ও বিলাতী লবণ কেহ ক্রয় করিবে না, ইহার আন্দোলন আরম্ভ হইল।

দেশীয় তাঁতিকুল ধ্বংস হইতেছে, দেশীয় শিল্প বিলাতী আমদানির জন্য একেবারে সমস্তই নিঃশেষ হইতেছে একথা নূতন নহে, গত ৪০ বৎসর ইহা সকলেই দেখিতেছে, কিন্তু কেহ ইহার প্রতিবিধানে এতদিন যত্নবান্ হয় নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় আগ্রহের সহিত দেশী দ্রব্য তাচ্ছল্য করিয়া বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করেন। আমি অনেক সময় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছি ও মধ্যে মধ্যে দেশে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু সাধারণ ব্যবহার জন্য সে সকল বস্ত্র অনুপযোগী, প্রায়ই অল্পদিন ব্যবহারে ছিন্ন হইয়া যায়। ১৮৯২ সালে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আমাব যত্ন নিষ্ফল হইল। ১৯০৩ সালে যখন লক্ষ্মামিলের বস্ত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাই ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু আমদানি অল্প, সংগ্রহ করা দুষ্কর। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে দেশের কি বিশেষ ক্ষতি তাহা ত আমার বোধগম্য হইল না। পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসিগণ বিহার ও উড়িষ্যায় সরকারী চাকরি ও ব্যবসাদি করিবার সুযোগ পাইত ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অধিবাসীরা আসাম প্রদেশে সেই সুযোগ পাইত। ক্ষতি কিছুই নাই, বরং ইহাতে লাভ হইয়াছিল। কেবল

বাঙ্গালাভাষা যাহারা বলে তাহারা দুই অংশে বিভিন্ন হইল এইমাত্র মানসিক বা Sentimental ক্ষতি। কিন্তু সে সময় দেশের লোক যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কোন বিচার সঙ্গত বাক্য বলিবার ও শুনিবার অবসর কোথায়। সে কথা লিখিলে কোন সংবাদপত্র তাহা মুদ্রিত করিবেনা। জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে উকিলগণ এক সভা করিয়া দেশীয় দ্রব্যাগার স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৫০০০৲ টাকা মূলধনে এক দোকান খোলা সাব্যস্ত হইল।

৫০০০৲ টাকা উঠিল, দোকানও খোলা হইল। আমি Managing Director হইলাম। দুইজন দোকানদার বহাল হইল। আহমদাবাদের কৃষ্ণামিল বাঙ্গালিদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে লাগিল। বোম্বের অন্যান্য মিল ও শ্রীরামপুরের লক্ষ্মীকটন মিল, দেশীয় হস্তনির্ম্মিত ধুতি ও শাড়ী, কলিকাতা হইতে দেশীয় শিল্পের কাগজ, কলম প্রভৃতি আমদানি করা গেল। প্রথমে লোকের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল, বিক্রয়ও কিছুদিন আশানুরূপ হইল। নিয়ম স্থাপন হইল যে টাকায় দুই পয়সার অধিক বৃদ্ধি নেওয়া যাইবে না। খরচা বাদ দিলে দুই পয়সার অল্প ভগ্নাংশই লাভে পৌঁছে। ক্রমে কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। কলিকাতায় যাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করা সহজ নহে। ডিরেক্টারগণের মধ্যে কেহ কেহ যাইতেন, আমিও কখনও কখনও যাইয়া খরিদ করিতাম। শীতবস্ত্র কানপুর ও অমৃতসর হইতে আসিত। ক্রমে মূলধন বৃদ্ধি হইয়া

৫০০০৲ হাজারের স্থানে ৬০০০৲ হইল। এই দোকান প্রায় ৬ বৎসর চলিয়াছিল। ১৯১২ সালের প্রথমেই বন্ধ হইয়া যায়।

দোকানে ক্ষতি ভিন্ন কখনই লাভ হয় নাই।

১। প্রথমে মিল হইতে যে সমস্ত বস্ত্রাদি খরিদ হয়, তাহা প্রায়ই ভাল নহে। পাড়ের কার্য্য ও বর্ণ প্রায়ই কদাকার, বস্ত্রও সুন্দর বুনানি নহে। এইজন্য প্রায় ২০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের বস্ত্র অবিক্রীত অবস্থায় ছিল।

২। দেশীয় হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রে অনেক লোকসান দেখা গেল, সেগুলি অনেক বিক্রয়ের অযোগ্য হইয়া উঠিল।

৩। দেশীয় আন্দোলনের আগ্রহ অনেক কমিয়া গেল, বিলাতী মিলের বস্ত্রাদি অনেক অংশে উত্তম ও মূল্যেও কিছু কম, এজন্য আমাদের দোকানের দ্রব্য বিক্রয় হওয়া ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল।

৪। কতকগুলি লোক আমাদের দোকানের নিন্দা করিতে লাগিল। প্রায়ই মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিতে লাগিল।

৫। দোকানের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীব অভাব হইয়া উঠিল।

৬। বস্ত্রাদি চুরি যাইতে লাগিল।

৭। অনেক ভদ্রলোক দ্রব্যাদি বাকি লইয়া মূল্য দেন না। কেহ কেহ একেবারে ফাঁকি দেন, কেহবা ৫০।৬০৲ টাকা বাকি রাখিয়া মাসে ২।৪৲ টাকা আদায় করেন।

৮। নালিশ করিয়া লোকের শত্রুতা বৃদ্ধি কবিতে হইল।

১৯১০ সালের জুন মাসে দোকান বন্ধ করা হইল। আমি Sole Liquidator বহাল হইলাম। দোকানের মজুত মাল বিক্রয় করিতে ও বকেয়া টাকা আদায় করিতে এক বৎসরের অধিক সময় লাগিল।

যাহা আদায় হইল তাহাতে প্রায় শতকরা ৫১ অংশীদারেরা ফেরৎ পাইলেন। আমার নিজের ৭০০৲ টাকার অংশ ছিল। ৬ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ৩৫০৲ টাকা ক্ষতি দিয়া কার্য্য শেষ করিলাম।

স্থির মূল্যে বস্ত্রের দোকান চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহাই সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইল। এই ক্ষতির জন্য ডিরেক্টারগণ সকলেই দায়ী, আমি একা নহি।

স্বদেশী শিল্পের উদ্ধার ও বিদেশী পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। এই আন্দোলন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, এখানেও কম নহে। বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া সাধারণ লোককে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় নিষেধ করিতে লাগিল, যে দোকানদার বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ, স্থানে স্থানে তাহাদের মাল জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। একদিন বিকালে বাজারের মধ্যে দেখিলাম কয়েকটি যুবক একখানি বস্ত্র পোড়াইতেছে, জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে এক গ্রাম্য ব্যক্তি বিলাতী ধুতি ক্রয় করিয়াছিল, তাহাকে মূল্য দিয়া ঐ বস্ত্রখানিতে অগ্নি দেওয়া

হইয়াছে। আমি তাহাদের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম তাহারা সে জন্য অনুতাপ করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলপূর্ব্বক বস্ত্রদাহ, দোকান ধ্বংস কিছুদিন চলিয়াছিল। এদেশে লিভারপুল লবণ সাধারণতঃ চলতি আছে। তাহার স্থানে কাঙ্কর লবণ বিক্রয় হইতে লাগিল। কিন্তু কাঁকর লবণও দেশী নহে, আরব বা স্পেন হইতে আসে। যবদ্বীপ, অষ্ট্রিয়া হইতে সস্তা চিনি আমদানি হইতেছিল, তাহাও নিবারণ করিবার উপায় ছিল না। তবে যাহারা বিশেষ দেশভক্ত তাহারা চিনি ক্রয় উঠাইয়া দিল। তাহারা গুড় ব্যবহার করিত। দেশী চিনি অপরিষ্কার, আর তাহেরপুরে যে পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত হইত তাহার মূল্যও অধিক, অথচ দুষ্প্রাপ্য।

দেশীকলে বা হাতে যে বস্ত্র বয়ন হইত তাহা যৎসামান্য, তাহাতে সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব।

গভর্ণমেণ্ট যুবকদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনেক যুবক রাজদ্বারে দণ্ডিত হইল। সে সময় যদি গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকের প্রতি কিছু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্বদেশী শিল্পের উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে দেশের সমূহ উপকার হইত। জার্ম্মান যুদ্ধে যেরূপ দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছে তাহা কতক পরিমাণে লাঘব হইত। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট যেমন সূক্ষ্ম বিচারের প্রতি খরদৃষ্টি রাখেন, সেরকম দেশের অবস্থার প্রতি কখনই রাখেন না। তখন জার্ম্মান ইংরাজের

প্রতিবাসী, শ্বেতকায়, অসভ্য, কৃষ্ণবর্ণ দেশী নহে, সহানুভূতি অধিক তাহাদিগের প্রতি হওয়াই সম্ভব ছিল। এখন বুঝিতেছেন, কৃষ্ণকায় দেশী লোক তাহার পরমাত্মীয় এবং জার্ম্মান স্বেতাঙ্গ সুসভ্য হইলেও পরম শত্রু। কিন্তু যুদ্ধ অবসান হইলে সেভাব কি আর থাকিবে? বিশেষ সন্দেহ। এই মনের ভাব যতদিন বজায় থাকে ততদিন মঙ্গল। ততদিন দেশীয় লোককে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের শিল্পের উন্নতি করা, যাহাতে তাহারা সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হয়, দেশের অর্থ বৃদ্ধি করা ও দেশীয় লোককে সর্ব কর্ম্মক্ষম করা গভর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া এখন গণ্য হইতেছে।*

* [১৯১৫ সালে লিখিত।]

পরিশিষ্ট

মন্মথকুমার বসু

(১৮[illegible]৫ -১৯২৪ খৃঃ)

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বাগাণ্ডাগ্রামের বসু বংশীয় নীলকণ্ঠ নামক এক ব্যক্তি বিদ্যানন্দ-কাঠির ঘোষ বংশে বিবাহ করিয়া এই গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহাকে সামান্য কিছু (৪ বিঘা) জমি দেওয়া হয়, তাহার উপরে তিনি কাঁচা ঘর তৈযার করিয়া বাস করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং তিনি পুনর্ব্বার অন্যত্র দার পরিগ্রহ করেন এবং ঘোষদিগের বিরাগভাজন হন।

তাঁহার পুত্র বিষ্ণুরাম বসু সে কালের কায়স্থ বংশের উপযুক্ত কিছু বিদ্যাশিক্ষা করেন, এবং নলডাঙ্গার রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া বিদ্যানন্দকাঠিতে কিছু সম্পত্তি খরিদ করেন। খাজুরা গহেরপুর গ্রামের মিত্র পরিবারে তিনি নন্দরাণী নাম্নী বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে তাঁহার দুর্গাপ্রসাদ (১৭৬৯-১৮৬৫) ওরফে নশিরাম এবং ভবানীশঙ্কর নামে দুই পুত্র হয়। সেকালে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন এদেশে অল্পই ছিল, তথাপি দুই পুত্রই লিখন পঠনে অভ্যস্ত ছিলেন। দুজনেই সবল এবং সুস্থকায় ছিলেন ও দুর্গাপ্রসাদ শারীরিক শক্তির জন্য এবং তীরন্দাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং বহুকষ্টে নিজেদের এবং তাঁহাদের মাতার ভরণপোষণ

করিতেন। গ্রামের পশ্চিমাংশে ২০ বিঘা নিচু জমি তাঁহারা চাষের উপযোগী করেন। তাঁহারা তাঁহাদের মাতাকে লইয়া নানাতীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এ সময় ঘোষ পরিবারের বিপক্ষতায় বসু ভ্রাতাগণকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতাদিগের সাহস ও শক্তি তাঁহাদিগকে কখনও ত্যাগ করে নাই।

প্রায় ২০ বৎসর বয়সে দুর্গাপ্রসাদ মজিলপুরের ঘোষ পরিবারের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা অন্নদাময়ী বা অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করেন (মৃত্যু ১৮৭৩)। ইনি মন্মথকুমারের পিতামহী। ইনি সাতিশয় সরল-হৃদয়া এবং স্নেহ-পরায়ণা ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা এবং পুত্রবধূদের সকলকেই অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে অল্প বয়সেই গৃহস্থালীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামী অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরেই দুর্গাপ্রসাদের মাতৃ বিয়োগ হয়।

ভবানীশঙ্কর রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের জমিদারীতে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার অগ্রজ দুর্গাপ্রসাদ ঐ জমিদারীর নায়েব পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ভ্রাতাদিগের কার্য্যদক্ষতা সন্তোষজনক ছিল এবং তাঁহারা পাল-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে হাড়িয়া গোপ নামক একটী গাঁতি বন্দোবস্ত লন।

দুর্গাপ্রসাদের ছয় পুত্র এবং এক কন্যা হয়। পুত্রদিগের নাম যথাক্রমে আনন্দ চন্দ্র (জন্ম ১৮০৮, মৃত্যু ১৮৭৫), উমাকান্ত (জন্ম ১৮১২ মৃত্যু ১৮৫২). শম্ভু, ঈশান (অল্প বয়সেই মৃত হন,), গোবিন্দ চন্দ্র (পুত্রহীন, স্ত্রী অমৃতমণি, উমাকান্তের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মারা যান) ও রাসবিহারী (জন্ম ১৮২৭, মৃত্যু ১৮৭৮), কন্যা তারামণি।

আনন্দচন্দ্রকে ১৬ বৎসর বয়সে রাণাঘাটে শিক্ষার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। তিনি পালচৌধুরী বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েন এবং সেখানেই অনেকদিন বাস করেন।

দ্বিতীয় পুত্র উমাকান্ত টাকি'ত পার্শিভাষা শিক্ষা করিয়া অল্প বয়সে যশোহরের কালেক্টারীতে ১৩৲ বেতনে মোহরের কর্ম্মপ্রাপ্ত হয়েন। এদিকে আনন্দ চন্দ্র কোনও প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে তাঁহাব প্রতিপোষকের বিবাগভাজন হইয়া রাণাঘাট হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সেকালে জমিদারগণের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল এবং পালচৌধুরী মহাশয় আনন্দের মস্তক ছেদনেব আদেশ দেন। মস্তকছেদন আর হইয়া উঠে নাই কিন্তু তাঁহার পিতাকে কর্ম্মচ্যুত এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। বসু পরিবার এইরূপে আবার কষ্টে পড়িলেন।

১৮৩৯ সালে উমাকান্ত খুলনা জেলার কাঠিপাড়া মাগুরা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবাবের কন্যা গুনমণিকে বিবাহ করেন। এই বৎসরেই তাঁহার গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, এবং ইহার পব কয়েক বৎসর তাঁহাদের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা হয়। যাহা হউক উমাকান্ত যশোহরে 2nd grade উকিল হন এবং পালচৌধুরীদিগেব সহিত সম্পত্তির জন্য মোকদ্দমা করেন। এই মোকদ্দমাতে তাঁহার জয়লাভ হয় এবং তিনি হাড়িয়া গোপ গাঁতি পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন এবং ৪০০০৲ টাকা ওয়াশিলাতের দরুণ পান। এই টাকাতে তিনি দত্ত গাঁতি নামক পত্তনির বন্দোবস্ত লয়েন এবং পাকাবাড়ী প্রস্তুত করেন। ইহার পর তিনি 1st grade pleader পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৪ পুত্র, ১ কন্যা এবং অন্তঃসত্ত্বা পত্নী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, মন্মথকুমারের বয়স তখন ৪ বৎসর মাত্র।

উমাকান্তের পুত্রদিগের নাম যথাক্রমে ঃ—

প্রসন্নকুমার (জন্ম খৃঃ ১৮৪১, মৃত্যু খৃঃ ১৯২৯)

বসন্তকুমার (জন্ম খৃঃ ১৮৪৫, মৃত্যু খৃঃ ১৯০৮)

মন্মথকুমার (জন্ম জুন ১৮৪৮ মৃত্যু খৃঃ ১৯২৪)

কেশবকুমার (জন্ম খৃঃ ১৮৪৯, মৃত্যু খৃঃ ১৮৭৭)

শিখরকুমার (Posthumous, জন্ম খৃঃ ১৮৫৩ মৃত্যু ১৯৩৬)

এবং কন্যা—বিরাজমোহিনী—(জন্ম খৃঃ ১৮৫১ মৃত্যু ১৯৩৮)

মন্মথকুমারের স্বরচিত জীবনস্মৃতি হইতে তাঁহার বাল্যজীবন ও শিক্ষার বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"১২৫৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে (জুন ১৮৪৮) যশোহর জেলার বিদ্যানন্দকাটি গ্রামে এ পক্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে পিতৃদেব রোগগ্রস্ত হইয়া যশোহর হইতে গৃহে আসিলেন। জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশে চিকিৎসক নাই। শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যও দুর্লভ। ২।৪ টা ঔষধ জানেন ও হস্ত লিখিত ২।৪ গণ্ডা ঔষধ প্রস্তুতের প্রকরণ রাখেন এমন লোক ভদ্র পল্লীতে প্রায় পাওয়া যাইত। সেরূপ চিকিৎসক নিযুক্ত হইল কিন্তু কোনও ফল হইল না। একদিন সন্ধ্যার সময় দাদাদের সঙ্গে পাঠশালা হইতে গৃহাভ্যন্তরে আসিলে আমাদিগকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া শুইতে দিল। আহারের নামও করিল না। অল্প পরে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

পিতা অল্পদিন মাত্র যশোহরে ওকালতি করিয়াছিলেন। সে কালে উকিলদিগের মান প্রতিপত্তি একালের মত ছিল না। আয়ও সামান্য ছিল। তখন আমলাদেরই কাল। ৮৲ টাকা মাহিনার সেরেস্তাদার তখন মাসে ১০০০৲ টাকা উপায় করিত। জেলার প্রধান উকিল ৫০৲ টাকার অধিক আয় করিতে পারিতেন না।

পিতা সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি জমিদারের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া বংশের মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু নিজ সন্তানদিগের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তখন পিতামহ, পিতামহী বর্ত্তমান ও পিতার দুই সহোদর ভ্রাতা ও দুই খুল্লতাত ভ্রাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নীও সংসারে থাকিত। তাঁহাদের পুত্রকন্যা লইয়া আমরা আট নয় ভ্রাতা ও চার পাঁচ ভগ্নী এক গৃহে প্রতিপালিত হই। এই বৃহৎ পরিবারের আয় বৎসরে ৪০০৲ টাকার অধিক ছিল না। ইহাতেই আমরা গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়া পরিগণিত। কারণ আমরা রূপার মল, আটবেকি ও সোনার বাজু পরিতাম। ইহার অল্পদিন পরে খুল্লতাত মহাশয় রাসবিহারী মুনসেফী চাকুরী পাইলেন। তখন মুনসেফের মাহিনা ১০০৲ টাকা, সেই অবধি আবার দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল।”

শিক্ষা

“যখন খুড়া মহাশয় মুনসেফ হইয়া ফরিদপুর আসিলেন সেই সময় ১৮৫৪ সালে তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে ইংরাজী স্কুলে পড়িবার জন্য সেখানে লইয়া গেলেন। আমার যখন আট বৎসর বয়স হইল তখনও আমাকে লইলেন না। আমার জেঠা মহাশয়ের এক শ্বশুরবাড়ী ছিল আলকা মুক্তাশ্বরী সেখানে অল্পদিনের জন্য একজন ইংরাজী শিক্ষক স্কুল স্থাপন করিলেন। জেঠা মহাশয় ইংরাজী পড়িবার জন্য আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। সে মাষ্টার একমাস পরে চলিয়া গেল। আমার ইংরাজী বর্ণপরিচয় মাত্র শিক্ষা হইল।

১৮৫৭ সালে (বয়স ৯ বৎসর) অক্টোবর মাসে জ্যেষ্ঠদিগের সহিত ফরিদপুর গিয়াছিলাম। খুল্লতাত রাসবিহারী তখন সেখানে ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট। নৌকায় যাইতে ১১ দিন লাগিয়াছিল। সেখানে আমি বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পরে ভাদ্রমাসে খুড়া মহাশয় হুগলি জেলায় জাহানাবাদে বদলি হইলেন, আমরাও গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরে ১৮৫৯ সালের আষাঢ় মাসে যশোহর যাই, সেখানে ১ মাস থাকিয়া জ্বর হইয়া চলিয়া আসিলাম। আবার ১৮৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যশোহর যাই। খুড়া মহাশয় খরচ পাঠাইতেন, সে টাকা অন্য একজনের নিকট থাকিত। আমরা ছয় জন এক গৃহের বালক একটী বাসাতে থাকিতাম, আমাদের ছয় জনের তিন জন বয়োজ্যেষ্ঠ স্কুলে ভর্ত্তি হইল, আর তিন জনেব স্কুলের মাহিনা ১৲ টাকা করিয়া লাগিত তাহা না দেওয়াতে আমরা স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই।”

এখানে পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। অত্যন্ত অযত্ন এবং কষ্টের মধ্যে ছয়টী বালক কয় মাস যাপন করিয়া একটী কলেরায় প্রাণত্যাগ করার পর সকলে গৃহে ফিবিয়া যান। এই কয় মাসেব নির্য্যাতন, বিশেষতঃ ক্ষুধার যাতনা মন্মথকুমার জীবনে বিস্মৃত হয়েন নাই। ছয়টী বালকের বৈকালিক আহারের জন্য মাত্র ১টী পয়সা পাওয়া যাইত, তাহাতে বিচে কলা কিনিয়া প্রত্যেকে একটী করিয়া পাইতেন।

১৮৬০ সালের ডিসেম্বব মাসে ১২ বৎসব বয়সে মন্মথকুমাবকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি কবিয়া দেওয়া হয়।

অগ্রজ প্রসন্নকুমার ১৮৫৯ সালে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৬০ সালে (aet. 19 yrs.) Senior Scholarship প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ও Presidency College প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৬১ সালে তিনি B. A., ১৮৬২ সালে B. L., এবং ১৮৬৩ সালে (aet. 23 yrs) M. A., পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হন। “১৮৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে আমরা কলিকাতায় গেলাম। সেখানে আমি সংস্কৃত

কলেজের স্কুলের সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। প্রথম বৎসর দুই ক্লাস উত্তীর্ণ হইলাম। তার পরের ক্লাসে কিছু কিছু ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। ঋজুপাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ শেষ হইলে রঘুবংশ, তারপর কুমারসম্ভব, তারপর ভারবীর ˈাসে উঠিয়া স্কুল ত্যাগ করিলাম। দেখিলাম যে আমাব কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ যাহারা ইংরাজী স্কুলে পড়িতেছে তাহারা আমাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এই জন্য সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিযা ১৮৬৪ সালের পূজার বন্ধেব পর ভবানীপুর London Mission Societyর স্কুলে প্রবেশ করিলাম, ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলাম।"

"স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব পিতা গঙ্গাপ্রসাদ প্রসন্নকুমারের সহপাঠী ছিলেন। তিনিও তাঁহাব ভ্রাতা বাধিকাপ্রসাদ আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ দাদার সঙ্গে একত্র ১৮৬১ সালে B. A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েন এবং Medical Collegeএ প্রবেশ করেন। তাহাব মত সদাশয় নীতিপরায়ণ লোক দেশে অতি বিরল, অতি মিষ্টভাষী ও অস্বার্থপব ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত। ঐ সময় তিনি বিবাহ করিলেন ও কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীকেও ঐ বাসায় আনিলেন। শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী। তাঁহাকে আমি পড়াইতাম। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন না কিন্তু অতি সরল প্রকৃতি। কোনরূপ কপটতা তাঁহার মনে আসিত না। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। তিনি বোধ হয় আমার সমবয়স্কা ছিলেন, তথাপি তিনি তখন যুবতী—আমি বালক। কিন্তু তিনি নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে আমার সকল ভ্রাতাদের সহিত মাতৃবৎ ব্যবহাব করিতেন। তাহার পরেও তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে—তিনি চিরবালচিত্ত সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন।"

"গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। অমায়িক অকপট ও মিষ্টভাষী। প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আমার রেলগাড়ী চড়িবার সখ তিনি মিটাইয়াছিলেন। আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাসস্থান জিরেটবলাগড় লইয়া যান। মগরা ষ্টেশনে নামিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইয়া নৌকায় জিরেট গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে এক বিছানায় শুইতাম। হঠাৎ তাঁহার গায়ে পা লাগিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পদধূলি লইতাম, কিন্তু তিনি এমন বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেন, মনে হইত যে অপরাধ করিতেছি। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীও আমার নিকট কিছু দিন পড়িয়াছিলেন। তিনি পড়া বলিতে পারিতেন না, না পারিলেই প্রায় কাঁদিয়া ফেলিতেন।"

"১৮৬৫ সালের February মাসে দাদা কৃষ্ণনগরে ২০০৲ বেতনে কলেজের Law lecturer নিযুক্ত হইলেন। আমরাও কৃষ্ণনগরে আসিলাম। তখন বগুলা পর্য্যন্ত ট্রেণে আসিয়া হাঁসখালি পার হইয়া গোয়াড়ী আসিতে হইত। ঘোড়ারগাড়ী অতি কদর্য্য ২।৩ খানি ছিল তাহাও প্রায় পাওয়া যাইত না। গোশকটে আসিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তখন অতি অল্প লোক এখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত, সমস্ত দিনে ৫।৭ জনের অধিক হইবে না। এখন বোধ হয় ৫।৭ শত লোক যাতায়াত করে। তখন গোয়াড়ীতে প্রায় সমস্ত খড়ের ঘর ছিল, ২।১টি পাকা বাড়ী দেখা যাইত, প্রতি বৎসর শুষ্ককালে আগুন লাগিয়া বহু গৃহ দাহ হইত। রাস্তা সকলও কদর্য্য ছিল, তবে গোয়াড়ীর প্রধান সুখের জিনিষ খড়িয়া নদী, অবগাহন স্নান ও উত্তম পানীয় জল।"

"১৮৬৬ (aet. 18 yrs.) সালে জানুয়ারী মাস হইতে পড়ায় প্রথম মনোযোগ দিলাম।

১৮৬৭ (aet. 19 yrs) সালে Entrance পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এখানকার স্কুল সমূহের মধ্যে আমি প্রথম হইলাম ও ১৪৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম।

Presidency Collegeএ পড়িবার সাধ হইয়াছিল এজন্য সেখানে first yearএ দিন কতক ছিলাম কিন্তু mess সকল কদর্য্য এজন্য গ্রীষ্মের বন্ধের পর আবার কৃষ্ণনগর আসিলাম।

১৮৬৯ (aet. 21 yrs.) সালে ডিসেম্বর মাসে first Arts পরীক্ষা দিলাম। সেবার যদিও first gradeএ উত্তীর্ণ হইলাম (18th in the list) ও ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবের নাম আমার উপরে হইয়াছিল।"

ইহার অব্যবহিত পরে ২১ বৎসর বয়সে (ডিসেম্বর ১৮৬৯) মন্মথকুমারের খাজুরা নিবাসী কালীকান্ত মিত্র মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা বসন্তকুমারীর সহিত বিবাহ হয়।

মহাসমারোহে ২১খানা পালকি ও তদনুরূপ বাদ্যভাণ্ড ও বাজি লইয়া বিদ্যানন্দকাঠি হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে খাজুরায় যাইয়া বিবাহ হইল। "F.A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দুই ভাই Presidency Collegeএ গেলাম ও লালবাজার হিন্দু হোষ্টেলে অবস্থিতি করিলাম।"

১৮৭২ সালে দুই ভাই B. A. পাস করেন। এবার মন্মথকুমারের নামই উপরে হইয়াছিল। তিনি প্রথম বিভাগে—পঞ্চম স্থান অধিকার করেন ও Ryan Scholarship (মাসে ৪০৲) পান।

এই সময় হইতে মন্মথকুমারের ১০ বৎসর জীবন সুখকর হয় নাই, অনেক প্রকার মনোকষ্ট ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নানা প্রকার নিষ্ফল ও স্বল্পফলপ্রদ চেষ্টায় মনের শান্তির একেবারে অভাব হইয়াছিল।

মধ্যজীবন ও রাজকার্য্য

"১৮৭৩ সালের July মাসে Mathematicsএ M. A. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হই। ইহার পর কি করা যায় ইহাই সমস্যা। দাদা বলিলেন B. L. উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইতে পারি কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে।

সে সময় Sir George Campbell, Lt. Governor এক নিয়ম করিয়াছিলেন, Survey, Law ও English পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে Deputy Magistrate, Sub-Deputy Magistrate ও Kanungoর পদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিন্তু ঘোড়ায় চড়া ও Gymnastics পরীক্ষায় পাস না করিলে চলিবে না। চুঁচুড়ায় Government এক Civil Service ক্লাস খুলিলেন তাহাতে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়া হইত এবং Survey, Law, Chemistry, Botany ও Gymnastics শিক্ষা হইত।

July মাসে চুঁচুড়া যাইয়া Civil Service Classএ প্রবেশ করিলাম। Chemistry, Botany আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। ঐ বিষয় শিখিতে আমার যথেষ্ট আগ্রহ হইয়াছিল। Gymnasticsও যত্ন করিয়া শিখিতাম, অশ্বারোহন প্রত্যহ করিতাম কিন্তু কিছুতেই আমার আসন শক্ত হয় না। ক্রমাগত আছাড়।

যাহা হউক February মাসে Riding এবং April মাসে আর সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে আমি দ্বিতীয় হইয়াছি, কিন্তু যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি সেই সময় লোকান্তর প্রাপ্ত হন, আমিই প্রথম।" (অগাষ্ট ১৮৭৪)

"সেই সময় Sir George Campbell কার্য্য ত্যাগ করিলে Sir

Richard Temple, Lt. Governor হইলেন। Campbell সাহেবের সঙ্গে Civil Service classও উঠিয়া গেল। যাহারা পাস হইয়াছিল তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। আমরা জন ১০।১২ first gradeএ উত্তীর্ণ হই, আমাদিগকে ভাগ করি'। ২।২ জন্যপ্রত্যেক Commissioner-এর নিকট গেল। তাঁহারা আমাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। অন্যান্য Divisionএ প্রায় সকলেই শীঘ্র চাকরি পাইল, কেহ Deputy Magistrate কেহ Sub-Deputy হইল, আমাদের কিছুই হয় না।

১৮৭৪ সালে অক্টোবর এবং নভেম্বর দুইমাস আলিপুরে Sub-Deputy হইলাম।

১৮৭৫ সালে জানুয়ারী মাসে অল্পদিনের জন্য Court of Wardsএর অধীন ননীগোপাল রায় সাবর্ণ চৌধুরী নামক এক সামান্য Estateএর Manager নিযুক্ত হইয়া ৪ মাস ধরিয়া বরিষা গ্রামে ছিলাম।

আবার আগষ্ট মাসে ৩ মাসের জন্য খুলনায় Sub-Deputy হইলাম।

খুলনায় ম্যালেরিয়া জ্বর বাধাইয়া অগ্রাণ মাসে কৃষ্ণনগর আসিলাম। মনস্থ করিলাম আর চাকরির জন্য চেষ্টা করিব না, B. L. পরীক্ষা দিয়া উকিল হইব।

১৮৭৬ সালে জানুয়ারী মাসে B. L. পরীক্ষা দিলাম।

পরীক্ষার পরই সংবাদ পাইলাম সাতক্ষীরা ও বসিরহাটে Sub-Deputy বদলি হইয়াছে এবং আমায় যাইতে হইবে। ছয় সপ্তাহ পরে ঐ কার্য্যে বিদায় হইলাম।

আবার ১৫ দিন পরে (২২শে মার্চ্চ ১৮৭৬) বহাল হইলাম।

ইতিমধ্যে আমি B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। (13th in order of merit)। কিন্তু উকিল হওয়া দাদার অমত। আর নিশ্চিত

আয় ত্যাগ করা বিবাহিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আবার সেই সর্পসঙ্কুল দাঁতভাঙ্গার বিলে সরকারী জমী হইতে জমিদারী জমি জরিপ করিয়া পৃথক করার কার্য্যে পুনর্ব্বার নিয়োজিত হইলাম।

সাতক্ষীরায় প্রথমে একখানি গোয়ালঘরের ন্যায় কুটিরে ছিলাম। পরে নিজে ৪ খানি ক্ষুদ্র কুটির প্রস্তুত করিয়া সেখানে পরিবার আনিলাম।"

১লা মে ১৮৭৭ Sub-Deputy Collectorএর চাকরি পাকা হয় এবং ১৮৮২ সালের জুলাই পর্য্যন্ত সাতক্ষীরাতে অবস্থান করেন।

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে পাটনাতে Special Road Cess Revaluation Deputy Collector হইয়া বদলি হন।

এই কার্য্য ১৮৮৪ সালে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলে। তারপর Officiating Deputy Magistrate হইয়া বাঁকিপুরে আর ১ মাস থাকিয়া, ৯ মে গয়াতে বদলি হন।

গয়াতে ১৮৮৪ সালের মে হইতে ১৮৮৬ সালের মে পর্য্যন্ত পুরা ২ বৎসর থাকিয়া, কৃষ্ণনগরে বদলি হন। এইখানে ১লা জুলাই ১৮৮৭ সালে Native Civil Service পরীক্ষাতে প্রথম হওয়ার ১৩ বৎসর পরে Deputy Magistrate এর কার্য্য পাকা হয় এবং ৬ই জানুয়ারী ১৮৮৮ সালে বীরভূম বদলি হন। সেখানে ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ পর্য্যন্ত। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ হইতে জুলাই ১৮৯৩ পর্য্যন্ত বনগ্রামে S. D. O.

২৭ জুলাই ১৮৯৩—বর্দ্ধমান, সেখানে ১৮৯৫ সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত। মধ্যে ২রা আগষ্ট ১৮৯৫ হইতে ৩ মাস ছুটী লন।

১৮৯৫ সালের ১১ নভেম্বর কুমিল্লায় বদলি হন। সেখানে ১৮ জুন ১৮৯৮ পর্য্যন্ত থাকিয়া ২ মাস ছুটী লন।

২৬ অগাষ্ট ১৮৯৮ সালে ঢাকা বদলি হন সেখান হইতে ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ সালে যশোহর। সেখান হইতে ২১ অগাষ্ট ১৯০২ সালে বগুড়া বদলি হন। ১৯০৪ সালের জুন মাসের ১৬ তারিখে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শেষ জীবন

অবসর গ্রহণান্তর কৃষ্ণনগরে ১৮৯৫ সালে যে নিজ বাসগৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সেখানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

এখানে আসিয়া প্রথম কয়েক বৎসর নদীর ধারে জমি লইয়া সব্‌জি ও ফলের বাগান করেন কিন্তু ক্রমশঃ শারীরিক পরিশ্রম কষ্টদায়ক হওয়াতে ইহা ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণনগরে প্রথমে স্বদেশী দ্রব্যাগার পত্তন হইলে তিনি ইহার অবৈতনিক Managing Director রূপে কার্য্য করেন। এই দোকান ৬ বৎসর চলিয়া ১৯১০ সালে বন্ধ হইয়া যায়। Director ও Shareholder দের ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতা এবং সাধারণের স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি প্রাণের টানের অভাবই ইহার কারণ। পরে মন্মথকুমার Sole liquidator রূপে দোকান উঠাইয়া Shareholder দিগকে শতকরা ৫১৲ টাকা ফেরৎ দিতে সক্ষম হয়েন। ইহাতে তাঁহার নিজের ৩৫০৲ টাকা লোকসান হয় এবং ছয় বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড হওয়াতে মনোকষ্ট হয়।

তিনি বিস্তানন্দকাঠি গ্রামের স্কুলের জন্য অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্কুলটী খুড়া রাসবিহারী বসু ১৮৭০ সালে স্থাপন করেন। বালকদের জন্য মাইনর স্কুল এবং বালিকাদিগের জন্য প্রাইমারী স্কুল। স্কুলের জন্য একটী পাকা দালানও তিনি করিয়া দেন। তাঁহার কাল হইলে দাদা প্রসন্নকুমার এই স্কুলের Secretary

ছিলেন, পরে ১৯০০ সালে তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিলে মন্মথকুমার ইহার সেক্রেটারী হন।

১৯০১ সালে ভ্রাতা শিখরকুমার বিষ্ণানন্দ-কাঠিতে কিছুদিন বাস করেন। তখন তাঁহার উৎসাহে এবং মন্মথকুমারের চেষ্টায় স্কুলটী উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

এই স্কুলের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলটি যদিও এখনও চলিতেছে তথাপি বিশেষ সন্তোষজনক অবস্থা ইহার এখনও হয় নাই। দেশের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকরতাই ইহার প্রধান কারণ।

কৃষ্ণনগরে আসিবার অল্পদিন পরে তিনি কুমারখালি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশানের Managing Director ও Secretary নির্ব্বাচিত হন। এই অবৈতনিক কার্য্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ২ বার উত্তরভারত এবং ২বার দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থস্থান এবং দ্রষ্টব্যস্থান পরিদর্শন করেন।

১৯১৭ সালে ১৭ই এপ্রিল তাঁহার সাধ্বী পত্নীর কৃষ্ণনগরে তিরোভাব হয়।

ইহার পর তিনি আরও ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু পুত্র-কন্যাগণ সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, নিজের শরীরও হাঁপানিতে অত্যন্ত জীর্ণ ও অধ্যয়ন দুরূহ হওয়াতে নিঃসঙ্গতা উত্তরোত্তর অধিক অনুভব করিতে থাকেন এবং ১৯২৪ সালের ৪ঠা অগাষ্ট তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের কর্ম্মস্থল রাজসাহীতে স্বইচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন।

উপসংহার

পুত্রের পক্ষে পিতার জীবনচরিত সমালোচনা করা কঠিন। কিন্তু মন্মথকুমারের জীবনের কতকগুলি বিশেষ গুণ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন আছে।

তাঁহার জীবনে অকপট সরলতা, সংযম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা ও সত্যাগ্রহের আশ্চর্য্য সমাবেশ হইয়াছিল।

আহারবিহারে তিনি চিরকাল সংযত এবং মিতাচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃপণ ছিলেন না। লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি দান যথেষ্ট করিতেন, বিস্থানন্দকাঠিতে এবং অন্যত্র তাঁহার বৃত্তিভোগী বরাবরই অনেক ছিল।

দেশপ্রিয়তা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, এবং স্বজাতির এবং স্বসমাজের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত, বহু চিন্তা তিনি ইহাতে ব্যয় করিয়াছিলেন। দেশী-শিল্প এবং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সাধ্যমত অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনও পশ্চাদপদ হয়েন নাই। পরিধেয় এবং অন্য যে সমস্ত সামগ্রী স্বদেশে প্রস্তুত হয় তাহাদের বিদেশী অনুকল্প-গুলি কখনও ক্রয় বা ব্যবহার করিতেন না।

তাঁহার বাকপটুতার অভাব ছিল। সামাজিক জীবনের "প্রয়োজনীয় মিথ্যা" বলিতে এবং মনের ভাব গোপন করিতে তিনি একান্ত অপারগ ছিলেন, সেজন্য লোকপ্রিয় তিনি কখনই হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থায় মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার কষ্ট হইত বলিয়া শাস্তি অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে এই অভিযোগ তাঁহাকে অনেকবার শুনিতে হইয়াছে।

চাটুবাক্য উচ্চারণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। হৃদয় এবং মন যেখানে অবনত নহে, সেখানে মস্তক অবনত করাও তাঁহার স্বভাবের বিপরীত ছিল। এজন্য সরকারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তাহাতে তাঁহার দুঃখ ছিল না। তাঁহার diary এবং journals এ তিনি তাঁহার স্বভাবের সীমারেখাগুলি সম্বন্ধে বার বার লিখিয়াছেন এবং তৎসত্ত্বেও যে সুখ শান্তি তিনি জীবনে লাভ করিয়াছিলেন তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করিতেন, অত্যল্প বয়স্ক শিশু বা বালক বালিকাকেও এমন কি ভৃত্যদিগকেও কখনও অশ্রদ্ধার সহিত তাড়না করেন নাই। পুত্রকন্যাদিগের সহিত বরাবরই শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিত যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি অসঙ্কোচে অপরিপক্ক বা অযৌক্তিক মত ব্যক্ত করিয়াছি তিনি সরলভাবে তাহার বিচার করিয়াছেন, মূর্খতা বা অনধিকার-চর্চ্চার ইঙ্গিত করিয়া কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। অন্যায় দেখিলে ভর্ৎসনা করিয়াছেন কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মাকে অশ্রদ্ধার দ্বারা পীড়িত কখনও করেন নাই।

আত্মনির্ভরতা এবং পরার্থপরতা এই দুই গুণকে তিনি অতি উচ্চ স্থান দিতেন। পরমুখাপেক্ষিতা তিনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতেন। অসুস্থ হইয়া পরের সেবা গ্রহণ করিতে হইবে এই চিন্তাই তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় করে। এবং যেখানে তিনি পরার্থপরতা দেখিয়াছেন সেইখানেই শ্রদ্ধালু হইয়াছেন। স্বার্থপরতা এবং নীচতা তিনি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। সরল মূর্খতা তিনি সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন না, কিন্তু মূর্খতার আত্মগরিমা এবং ক্ষুদ্রাশয়ের ধর্ম্মভান তাঁহার নিকট অসহনীয় ছিল।

কারণ যদিও তিনি অধ্যয়নেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

করিয়াছেন, অধ্যয়ন তাঁহার অবসর-বিনোদনের উপায় মাত্র ছিল না। জীবনে তিনি সত্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল শেষ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য তাজা ও সজাগ ছিল। মনের দ্বার তিনি কখনও অভ্যাসের নিগড়ে অর্গলিত করেন নাই। কোনও নূতন মতবাদ পাঠ করিলে বা শুনিলে তাহা বিচার করিয়া দেখিতেন এবং সত্য বলিয়া মনে হইলে তাহাকে যে শুধু মনে গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ হইতেন না তাহা নহে, জীবনে প্রয়োগ করিয়া দেখিতেও ছাড়িতেন না। সত্যকে তিনি শুধু মস্তিষ্কের ব্যাপার মনে করিতেন না, জীবনের অভ্যাসের বিষয় বলিয়াই বরাবর জানিতেন। আমার মনে হয় ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা।

সাধারণ লোক তাহাদের জ্ঞান বা বিদ্যা অনুসারে কথা বলে কিন্তু অভ্যাস সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারেই কার্য্য করে, কিন্তু যাঁহার প্রকৃতিই ছিল জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করা, যাঁহার মন সত্যের আগ্রহে সরল ভাবেই আগ্রহান্বিত ছিল এবং মন ও বাক্য যাঁহার সত্যেতে উৎসর্গিত ছিল সেই আমার স্বর্গগত পিতা, তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করুন আর নাই করুন তাঁহার জীবন কখনও বৃথা হয় নাই, হইতে পারে না। যে কোনও লোক তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার স্বভাবের এবং চরিত্রের প্রভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উপকৃত হইয়াছেন, ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু *

---

* ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে কৃষ্ণনগরে কুমারখালি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের গৃহে প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে পঠিত।